এস শ্রীকুমার এবং মঞ্জুল দাস বললেন

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াই-এ সামিল হোন পশ্চিমবাংলার কর্মচারীরা

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এস.শ্রী কুমার এবং অন্যতম সহ-সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুল দাস কিছুদিন আগে কলকাতায় এসেছিলেন। কয়েকদিন ছিলেনও কর্মচারী ভবনে। এই সময় সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁদের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাৎকারটি নেন পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে সুতপা হাজরা, মানস কুমার বড়ুয়া এবং সুমিত ভট্টাচার্য। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ, যুগ্ম-সম্পাদক অসিত কুমার ভট্টাচার্য, অন্যতম সহ-সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিনহা সহ বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের সর্বভারতীয় চিত্র, শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন সংগ্রাম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁরা। এখানে তা প্রকাশ করা হল।

সর্বভারতীয় নেতৃত্বদ্বয়ের সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে। (*ইনসেটে বাঁদিক থেকে যথাক্রমে এস শ্রীকুমার ও মঞ্জুল দাস*)

প্রঃ আপনি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হলেও, আপনার রাজ্য কেরালা। তাই প্রথম প্রশ্ন কেরালাকে নিয়েই। এই মুহূর্তে কেরালার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অবস্থান কি?

শ্রী কুমার : ১৯৫৬ সালে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রস্তাব কার্যকরী হওয়ার ফলে কেরালা রাজ্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৫৭ সালে ইএমএস নাম্বুদিরিপাদের নেতৃত্বে দেশের মধ্যে প্রথম বামপন্থী সরকার গঠিত হয়। ঐ সময় সরকার সাধাররণ মানুষ তথা রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের স্বার্থবাহী নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে। ঐ সরকারেই সিদ্ধান্ত হল প্রতি পাঁচ বছর অন্তর বেতন সংশোধন কমিটি গঠন করা হবে। সর্বশেষ বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সরকার নবম পে-কমিটির সুপারিশ কার্যকরী করে গেছিল। কিন্তু ২০১১ সালে ইউডি এফ সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর চেষ্টা করেছিল কর্মচারী ও শিক্ষকদের দাবিগুলিকে এড়িয়ে যেতে। কিন্তু শিক্ষক-কর্মচারীদের আন্দোলনের চাপে সরকার বাধ্য হয়েছে পে-রিভিশন কমিটি গঠন করতে। কমিটি তার রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেছে, কর্মচারী সংগঠনগুলির সাথে সরকারের এক প্রস্থ আলোচনাও হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে ১.৭.২০১৪ থেকে পে-কমিটির সুপারিশ কার্যকরী হবে। তবে এই জায়গায় সরকার এমনি আসেনি। রীতিমত আন্দোলন করতে হয়েছে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল কর্মচারী ও শিক্ষকরা অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘটে যাবেন। কিন্তু ২২ জুলাই ২০১৪, একদিনের ধর্মঘটের পর সরকার আমাদের দাবি মেনে নেয়। ফলে আমরাও লাগাতার ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসি। পে-কমিটির সুপারিশ ১.৭.২০১৪ থেকে কার্যকরী করার জানুয়ারি ২০১৫-তে ডাকা ধর্মঘটকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলাম।

প্রঃ কেরলে রাজ্য প্রশাসনে নিয়োগ পরিস্থিতি কেমন? চুক্তি প্রথায় নিয়োগ হচ্ছে কি?

শ্রী কুমার : স্থায়ী নিয়োগ সম্পূর্ণ বন্ধ একথা বলা যাবে না। তবে নিয়োগ হলেও তা হচ্ছে সীমিত আকারে। বহু শূণ্যপদ পড়ে থাকছে। তবে চুক্তি প্রথায় নিয়োগ শুরু হয়নি। সরকার যে চায় নি তা নয়। তবে শিক্ষক-কর্মচারীদের বিপুল আন্দোলনের চাপে তা করতে পারে নি। এই মুহূর্তে শিক্ষক-কর্মচারীদের মোট সংখ্যা ৫,৪১,০০০।

প্র ঃ অপরাপর অংশের শ্রমজীবী মানুষের কথা যদি বলেন।

শ্রী কুমার ঃ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ সরকার সমস্ত ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণ চাইছে! নারকেল শিল্প, রবার শিল্প এমনকি পর্যটন শিল্পেরও। শ্রমিকশ্রেণী এর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সময় এই সমস্যা ছিল না। মানুষ পার্থক্যটা বুঝতে পারছেন। শিক্ষক-কর্মচারীরাও শ্রমজীবীদের আন্দোলনের পাশে রয়েছেন।

প্র ঃ 'পেনশন' প্রসঙ্গে ইউ ডি এফ সরকারের অবস্থান কী?

শ্রী কুমার ঃ এল ডি এফ সরকার থাকার সময় কন্ট্রিবিউটরি পেনশন চালু করেনি। কিন্তু ইউ ডি এফ সরকার এসেই নয়া পেনশন

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড)-র দ্বাদশ রাজ্য সম্মেলন

সম্মেলনকে অভিনন্দিত করে বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার

একদিকে নিজস্ব দাবি দাওয়া আদায়ের লড়াই অন্যদিকে রাজ্যের উন্নয়ন, শান্তি-সম্প্রীতি-ঐক্য রক্ষার আন্দোলন। এই যৌথ দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ১ লক্ষ ৬৭ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীদের লড়াকু এবং সর্ববৃহৎ সংগঠন ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড)-র দ্বাদশ ত্রি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন। ১-৪ অক্টোবর, ২০১৫ নজরুল কলাক্ষেত্র, আগরতলায় সম্মেলন হয়।

প্রকাশ্য অধিবেশন ঃ

যতই ষড়যন্ত্র হোক ভাগ হতে দেওয়া যাবে না রাজ্যকে। যে কোন মূল্যে রক্ষা করা হবে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সৌভ্রাতৃত্বকে। বামফ্রন্ট সরকারের জনমুখী কর্মসূচীকে

(সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ হাসিম আব্দুল হালিমের জীবনাবসান

ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম এক মহীরূহ, রাজ্য বিধানসার রেকর্ড কালীন সময়ের একটানা অধ্যক্ষ (১৯৮২-২০১১) হাসিম আব্দুল হালিমের জীবনাবসান হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। ২ নভেম্বর সকাল ১০:১০ মিনিট নাগাদ তিনি প্রয়াত হন। সংসদীয় আইনের সমস্ত কিছু খুঁটিনাটি কোনো গ্রন্থেই সম্পূর্ণ ও নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভাবনা। কিন্তু গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ আইনসভায় অধ্যক্ষের ভূমিকা যেখানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অননুমেয় ঘটনায় কেমন রুলিং দিতে হবে তা তাৎক্ষণিক নিরূপিত হয় অধ্যক্ষের আসনে বসা ব্যক্তির প্রখর বিচারবোধ, রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ও সৃষ্টিশীল বুদ্ধি বিবেচনার ওপর। এই বিরল গুণাবলী কেন্দ্রতথা বিভিন্ন রাজ্যে ভারতীয় আইন সভা গুলির আসনে উপবিষ্ট যে মুষ্টিমেয় ক'জন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিল, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নামটি হল হাসিম আব্দুল হালিম। ফলস্বরূপ রাজ্যের গন্ডী ছাড়িয়ে ভূ-ভারত তো বটেই, এমনকি গোটা দুনিয়ার সংসদীয় জগতে তিনি আদায় করেছিলেন এক বিরল সম্ভ্রম। তাঁর এই বিরল গুণের স্বীকৃতি হিসাবেই তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ অলঙ্কৃত করেছেন কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টের পদ।

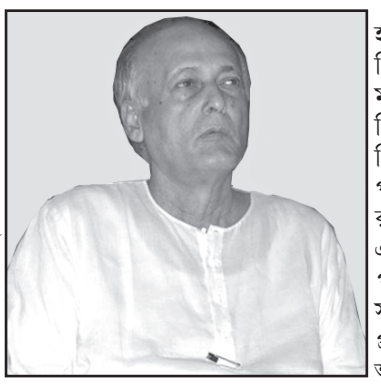

বিধান সভায় বরাবর তিনি সবিশেষ মর্যাদা দিতেন বিরোধী দলকে। তাঁর সময়েই বিরোধী দলের নেতাকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া আরম্ভ হয়।

হাসিম আব্দুল হালিমের পেশাগত জীবন শুরু হয় আইনজীবী হিসাবে। ১৯৭৭ সালে আমডাঙা বিধানসভা থেকে নির্বাচিত হয়ে প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় তিনি আইনমন্ত্রী ছিলেন। এ সময়ে বিনাবিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির বিষয়ে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৮১ সালে নির্বাচিত হয়ে তিনি রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন এবং একটানা ২৯ বছর সুনামের সঙ্গে বিধানসভা পরিচালনা করেন। তিনি আইনজীবীদের সর্বভারতীয় সংগঠন আইএলইউ-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক আইনজীবী সংঘের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। রাজ্যের বাম গণতান্ত্রিক নিরপেক্ষ আন্দোলনেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। □

সংগ্রামী হাতিয়ার
অক্টোবর ২০১৫
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
৪৪ তম বর্ষ □ ষষ্ঠ সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

শারদোৎসব ... কিন্তু, কেন, যদি ...

শারদোৎসব। বাঙালী তথা বাংলার সর্ববৃহৎ সামাজিক উৎসব। শরতের নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতন স্তূপ মেঘের ভেসে যাওয়া, আর মাঠে-প্রান্তরে ছেয়ে থাকা সাদা কাশফুল— শারদোৎসবের আগমনী বার্তার চিরন্তন ল্যান্ডস্কেপ। প্রকৃতির এই খেয়ালি সৃষ্টির মাঝেই, মহালয়ার ভোরে ইথার তরঙ্গে ভেসে আসা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ— 'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা ...', আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মনে শিহরণ তোলে— ঢাকে কাঠি পড়ল বলে। শারদোৎসব মানেই অনাবিল আনন্দ, দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি থেকে কয়েকদিনের ছুটি। বিশ্বের আর কোথাও, আর কোন উৎসবকে ঘিরে এমন হাজার-লক্ষ মানুষের স্রোত, এমন আলোর রোশনাই, অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতায় গড়ে তোলা এমন সব মণ্ডপ দেখা যায় কি না জানা নেই। সম্ভবত যায় না এবং সেই বিচারে শারদোৎসব অনন্য। সারা বছর ধরে অপেক্ষা করে বাঙালী কবে আসবে কাঙ্ক্ষিত ঐ কয়েকটি দিন। আসছে দীপাবলি, আরও একপ্রস্থ আলোর রোশনাই আর আতসবাজির যুগলবন্দী নিয়ে। সব মিলিয়ে এক ভরপুর উৎসবের মরশুম। সারা বছরের সঞ্চয়ের একাংশ নিয়ে ঘর ছেড়ে পাহাড়-সমুদ্র-জঙ্গলের টানে বেরিয়ে পড়ারও এক আদর্শ সময় এই উৎসবের কাল।

এতক্ষণ যা বলা হল, তাতো অনেক মানুষেরই কথা। উৎসবের আমেজকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার মতন বহু মানুষ। কিন্তু সবার কথা কি তাই? সবাই কি পারলেন মনের আনন্দে এই উৎসবে মিশে যেতে? সবার কি সাধ্য হল দোকান থেকে নতুন শাড়ি-জামা-ফ্রক কিনে এনে পরিবারের হাতে তুলে দিতে? হাজার হাজার ওয়াট আলোর রোশনাই কি পারল সব ঘরের অন্ধকারকে দূর করতে? হরেকরকম রসনা তৃপ্তিকার খাদ্যের পসরা কি পারল সব অভুক্ত-অর্ধভুক্ত মানুষগুলোর খিদের জ্বালায় শুকিয়ে যাওয়া মুখগুলোয় হাসি ফোটাতে? প্রাচুর্যের 'থিম' প্রতিযোগিতা কি পারল রিক্ত-জীর্ণ পরিবারগুলোর বোবা-কান্নার প্রতিযোগিতাকে চাপা দিতে? এত উৎসবের মাঝে আমরা কি একটুও ভাবার সুযোগ পেয়েছি, গ্রামের মাঠে ফুটে থাকা কাশফুলের অদূরেই একটি জীর্ণ কুটিরে কিছুদিন আগেই ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে, কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন এক কৃষক? অথবা সেই বাবার কথা, যে প্রতিবছর তার কিশোরী মেয়ের হাত ধরে মণ্ডপে মণ্ডপে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যেত? এবারেতো পারল না, কারণ পুজোর আগেই তার কিশোরী মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করেছে কিছু দুষ্কৃতী। যারা এই ঘৃণ্য কাজ করেছে, চোখের সামনে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। হয়তোবা কোন সর্বজনীন পুজোর আয়োজকও তারা। সেইসব মণ্ডপের ভিড়ে মিশে যেতে যেতে আমাদের চোখের সামনে কখনও কি ভেসে উঠেছে সদ্য সন্তান হারা বাবার শোকে পাথর হয়ে যাওয়া মুখটা? এক কলেজ-উত্তীর্ণ যুবক 'টেট' পরীক্ষায় বসবে বলে সবরকম প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু টেটকে কেন্দ্র করে দুর্নীতি আর অস্বচ্ছতার বাতাবরণ তাকে হতাশ করেছে। সে পরীক্ষায় বসেনি। সবথেকে বড় দুর্গার দর্শন না পেয়ে যাঁরা হা-হুতাশ করছিলেন, তাঁরা কি ভেবে দেখেছেন বেকারত্বের যন্ত্রণায় বিদ্ধ হতে থাকা একজন যুবকের হতাশার কাছে, তাদের হা-হুতাশ কতখানি অকিঞ্চিৎকর?

কেন এমন হয়? কেন সকলেই আলোকোজ্জ্বল উৎসবের বৃত্তে আসতে পারল না? যারা প্রকৃতই দুর্গতির শিকার, তারাই কেন থেকে গেল পুরাণ বর্ণিত দুর্গতিনাশিনীর মণ্ডপ থেকে অনেক দূরে, ধরা ছোঁয়ার বাইরে। একটু ভাবতে হবে। যে টুকরো টুকরো দু-একটি ঘটনার কথা বলা হল, সেগুলি কোনটিইতো প্রকৃতির আপন খেয়ালে ঘটে যাওয়া কোন দুর্ঘটনা নয়। মানুষেরই তৈরি সঙ্কট তাদের জীবনের সুখানুভূতিগুলিকে কেড়ে নিয়েছে। তাহলে পথ কি? ভবিষ্যতেও এমনভাবেই আসবে উৎসব, একটা বড় অংশকে এর বৃত্তের বাইরে রেখে? উৎসব-বৃত্তের পরিধিটাকে আরো বড় করার একটা প্রয়াস আমরা গ্রহণ করতে পারি না। এতে তো আমরা যারা বৃত্তের মধ্যে রয়েছি, তাদের উপভোগের মাত্রা এতটুকু কমবে না। খুব কঠিন কি? যদি আবারও এমন অবস্থা তৈরি করা যায়, যেখানে কৃষক কীটনাশক তার ফসলকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করবে, গলায় ঢালবে না। তাহলে আগামী শারদোৎসবে মাঠের আলপথ ধরে, কাশফুলে হাত ছুঁইয়ে তারাও শামিল হবে। রাজ্যে বর্তমান অবস্থার উত্তাপ কিছু অন্ধকারের কীটকে শীতঘুম থেকে তুলে গর্তের বাইরে টেনে এনেছে। নারীর ইজ্জত-সম্ভ্রমে হাত দিচ্ছে এরাই। যদি আবারও অনুকূল বাতাবরণের শৈত্য নামিয়ে আনা যায়, ঐ কীটগুলোকে গর্তে ঠেলে দিয়ে ভালো করে মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে নিশ্চিত আগামী শারদোৎসবের আগে নতুন করে আর কোন বাবাকে সন্তানের শোক বুকে বইতে হবে না। যদি কর্মহীন যুবককে একটা কাজের খোঁজ দেওয়ার ব্যবস্থা তৈরি করা যায়, তাহলে সেওতো নতুন জামা পরে আগামী বছর মণ্ডপে মণ্ডপে রাত জেগে ঘুরতে পারবে। খুব কঠিন কি আবার তেমন জায়গায় আমাদের রাজ্যটাকে নিয়ে যাওয়া? একেবারে স্বর্গরাজ্য নাই বা তৈরী হল। আশু সমস্যার সুরাহার মতন একটা পরিবেশতো তৈরী করা যায়। এতো কোন কল্পকথা নয়। ছিলতো তেমনই কিছু দিন আগেও। আবারও তেমন জায়গায় পৌঁছানই যায়। খুব কঠিন না। বাধা আসবে। বর্তমান অবস্থা যাদের 'ব্রিডিং গ্রাউন্ড' তারা তো চাইবেই একে টিকিয়ে রাখতে। হুমকি, বলপ্রয়োগ, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি সবরকম টোটকা দিয়ে বশীভূত ও পরাভূত করার চেষ্টা তো হবেই। কিন্তু একেও অতিক্রম করা যায়। প্রয়োজন সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি। জলের তাপমাত্রা যেমন স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছলে কেটলির ঢাকা দিয়ে তা চেপে রাখা যায় না, তেমনই মানুষের ইচ্ছাশক্তিও পরিবর্তনকামী স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছে গেলে রাষ্ট্রীয় দমননীতি তাকে চেপে রাখতে পারে না।

পুরাণ যা বলে তা বিশ্বাসের প্রশ্ন। বিতর্কেরও। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে 'গণতন্ত্র'ই প্রকৃত দুর্গতিনাশিনী। 'গণতন্ত্র'রূপী দুর্গতিনাশিনী পুরাণ বর্ণিত দশপ্রহরণধারিণী নন। জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছাই এর শক্তি, অবয়ব। গণতন্ত্রে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর জনগণই। অর্থাৎ আমরা। আমরা পারি না দুর্গতিনাশিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে? আগামী শারদোৎসবকে আরো অনেক অনেক বেশি মানুষের শারদোৎসবে পরিণত করার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে? পারি, শুধু প্রয়োজন ভিতরে ইচ্ছারূপী ঘুমন্ত ভিসুভিয়াস-এর জাগিয়ে তোলা। সেই লক্ষ্যেই আগামী শারদোৎসবের আগাম শুভেচ্ছা রইল। □

২ নভেম্বর, ২০১৫

গো-জিট্যাল ইন্ডিয়া

প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায় বর্ণিত বকচ্ছপ অথবা হাঁস-জারু কাহিনী আমাদের সকলের নিকট বাল্যকালে প্রবল হাস্য উদ্রেককারী চরিত্ররূপে প্রতিভাত হইত। এখনও উক্ত কবিতাসমূহ পাঠ করিবার সময়, পাঠরত বালক বালিকার কোমল মন 'আবোল-তাবোল' -এ রসোত্তীর্ণ কবিতাগুলির সহিত কবির স্ব-হস্তে অঙ্কিত চিত্রে উক্ত বিচিত্র জীবগুলির অবয়ব দেখিয়া যৎপরোনাস্ত পুলকিত হয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ইহা যে কবির কল্পনামাত্র, বাস্তবে উক্ত জীবগুলির যে কোন অস্তিত্ব নাই তাহা লইয়া শিশু মনে অতীতেও যেমন কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ক্রিয়া করে নাই, তেমনই আজও করে না। সে কারণেই বাস্তবে কোন শিশু তাহার পিতা-মাতা অথবা অভিভাবকের নিকট হাঁস-জারু অথবা বকচ্ছপকে স্বচক্ষে দেখিবার জন্য বায়না করেনাই, এখনও করে না।

হাঁস ও সজারু এবং বক ও কচ্ছপ — সম্পূর্ণ ভিন্ন জৈবিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও কবি কল্পনায় তাহারা যেমন সংযোজিত হইয়াছিল। কি অনুরূপ ভাবে তেমনই একই অঙ্গে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করাইবার পরিকল্পিত উদ্যোগ শুরু হইয়াছে। আশঙ্কার দিক হইল যে অঙ্গটিকে উক্ত 'হাঁসজারু মার্কা উদ্যোগকে ফলপ্রসু করিবার পরীক্ষাগার রূপে ব্যবহার করা হইতেছে, তাহা হইল আমাদের দেশমাতৃকা ভারতবর্ষ। এবং বিস্ময়কর হইলেও সত্য, কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠী স্ব-হস্তে এই দায়িত্ব সম্পন্ন করিতে বদ্ধপরিকর। পাঠক বন্ধুদের কৌতুহল নিরসন করিবার জন্য, বিষয়টি স-বিস্তারে বলিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহা এখন সর্বজনবিদিত বিষয় যে, মদীয় দেশের শাসন বিভাগের কার্যকরী প্রধান কান্ডারী (আনুষ্ঠানিক প্রধানকান্ডারী রাষ্ট্রপতি) মহাশয়ের স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশের প্রতি সবিশেষ দুর্বলতা রহিয়াছে। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পর, বিগত একবৎসরের কিয়ৎ অধিক কাল সময়ের অধিকাংশই সময়ই তিনি বিদেশে অতিবাহিত করিয়াছেন। কেতাদুরস্ত মূল্যবান বস্ত্র পরিধান করিয়া ঘনঘন বিদেশ ভ্রমণের সবগুলির কূটনৈতিক প্রয়োজনীয়তা লইয়া প্রশ্নও উত্থাপিত হইতে শুরু করিয়াছে। যদিও নিক্ষেপিত প্রশ্নবান কান্ডারী মহাশয়ের যাত্রাপথকে কণ্টকিত করিতে পারে নাই। ইহাও প্রতিভাত হইতেছে যে বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে মার্কিন মুলুকটি তাঁহার সবিশেষ পছন্দের। কারণ ইতিমধ্যে তিনি মার্কিন দেশে ভ্রমণ করিবার রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। মার্কিন শিরোমণির সহিত তাঁহার বিশেষ সখ্যতার কথাও, সংবাদমাধ্যম মারফৎ আমাদের গোচরে আসিয়াছে। সম্প্রতি এমনই এক ভ্রমণকালে তিনি মার্কিন দেশস্থ কয়েকটি বিশেষ সংস্থার কর্ণধারগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। উক্ত সংস্থাগুলি যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অন্তর্জালীয় ব্যবস্থার রথী-মহারথী স্বরূপ। যেমন, 'ফেসবুক', 'ট্যুইটার', হোয়াট্‌স্-অ্যাপ', 'হাইক' প্রমুখ। উক্ত সাক্ষাৎকারগুলির উদ্দেশ্য রূপে যাহা জানা গিয়াছে, তাহা অতীব আনন্দদায়ক সন্দেহ নাই। মদীয় দেশকে সর্বাধুনিক সম্পন্ন 'ডিজিট্যাল' করিবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা লইয়াই নাকি এমত যোগাযোগ স্থাপন করা হইতেছে।

ইহা লইয়া কোন পক্ষ হইতেই আপত্তি উঠিবার কোন কারণ নাই। স্বাগত জানানোই দস্তুর। কিন্তু কিমাশ্চর্য যাঁহারা দেশকে সর্বাধুনিক কৃৎ কৌশলেই সমৃদ্ধ করিবার প্রয়াস গ্রহণ করিতেছেন, তাহারাই সমাজের অভ্যন্তরে গরুকে লইয়া সবিশেষ তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। গো-মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করিতে হইবে, গৃহে গো-মাংস রাখিবার গুজব সৃষ্টি করিয়া গৃহ-কর্তাকে দিবালোকে পিটাইয়া হত্যা করা যাইবে। গাভীকে গো-মাতা রূপে পূজার্চননার ব্যবস্থাপনা করিতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানেই শেষ নহে। এযাবৎকালের স্বীকৃত, গবেষণা লব্ধ ইতিহাসের পরিবর্তন ঘটাতেই হইবে, আর্য সভ্যতাকে বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা রূপে। স্বীকৃতি প্রদান করিতে হইবে, রামায়ণ, ও মহাভারতকে ঐতিহাসিক ঘটনারূপে পাঠ্যপুস্তকে স্থান করিয়া দিতে হইবে। এমন কত কি নূতন নূতন বক্তব্য উত্থাপিত হইতেছে। শাসন বিভাগের কার্যকরী প্রধান কান্ডারী জনসমক্ষে ঘোষণা করিতেছেন পুরাকালে মদীয় দেশে পলামিট সার্জারি হইত। গণেশের হস্তী মস্তক নাকি ইহার প্রমাণ। অর্থাৎ গণেশও একজন ঐতিহাসিক চরিত্র। যদিও সর্বজ্ঞ ব্যক্তিটি ইহা জানাইতে পারেন নাই, উক্ত প্লাস্টিক সার্জারিটি কৈলাশে বসিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল নাকি গণেশের পিতা মহাদেব সপরিবারে তাঁহাকে দিল্লিতে লইয়া আসিয়াছিলেন অস্ত্রোপচারের জন্য। 'প্লাস্টিক সার্জারি' নামক ইংরাজী শব্দবন্ধটি পুরাকালে কিভাবে ব্যবহৃত হইল তাহারও জবাব মেলে নাই। হয়ত বা অদূর ভবিষ্যতে এমনও শুনিতে হইবে, ফেসবুক, ট্যুইটার যাহা বিজ্ঞানের অন্যতম সর্বাধুনিক অবদান—তাহাও। সুপ্রাচীন কালেই আমাদের দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর 'ই-মেল'-এর মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করিতেন।

শুধুমাত্র জাতির মানসিক গঠনকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও পশ্চাৎমুখী করিবার উদ্যোগই নয়, একই সাথে জন্ম লইতেছে প্রবল অসহিষ্ণুতা। কে সঙ্গীত পরিবেশন করিবেন, কি চিত্র অঙ্কিত হইবে, কাহার পুস্তক দিনের আলো দেখিবে প্রভৃতি সর্ব কিছুতেই চলিতেছে খবরদারি। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার পারদ ক্রমশ মাত্রা ছাড়াইতেছে।

একদিকে গো-মূত্র পান করিবার বিধান অপরদিকে ডিজিট্যাল দেশ গড়িবার প্রতিশ্রুতি — এই দুইয়ের মেল বন্ধন কি সম্ভব? পশ্চাৎমুখী কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিস্তার সম তেল আর আধুনিকতা ঔজ্জ্বল্যসম জল কি মিশিতে পারে কখনও? আধুনিক মনন ব্যতীত আধুনিক প্রযুক্তির কার্যকরী ব্যবহার সম্ভব কি?

'গো-মাতা'র ভারতবর্ষ ও ডিজিট্যাল ইন্ডিয়াকে এক ঘাটে জল খাওয়াইবার উদ্যোগকে আমরা কি কহিব? সুকুমার রায় জীবিত থাকিলে নিশ্চিতভাবেই নামকরণ করিতেন — 'গো-জিট্যাল ইন্ডিয়া।' □

১৫ কার্তিক, ১৪২২

স্বাস্থ্যভবন কো-অপারেটিভ ক্যান্টিন নির্বাচনে সব আসনেই কর্মচারী স্বার্থ-বিরোধীরা পর্যুদস্ত

গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ স্বাস্থ্যভবন কো-অপারেটিভ ক্যান্টিনের নির্বাচন সম্পন্ন হল। প্রত্যাশামতই প্রগতিশীল প্রার্থীরা সবকটি আসনে জয়লাভ করেন। ৯টি আসনের মধ্যে ৯টি আসনই তাঁরা নিজেদের পক্ষে রেখে দিতে সক্ষম হয়েছেন। তৃণমূল ফেডারেশন সমর্থিত দুটি গোষ্ঠীর মোট ১৫ জন প্রার্থী আর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সমর্থিত প্রগতিশীলরা ৯জন অর্থাৎ সর্বমোট ২৪ জন প্রার্থী ৯টি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মোট ৩০৮ জন ভোটারের মধ্যে ২৭৮ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ৩টি ভোট বাতিল হয়। ২৭৫টি ভোটের মধ্যে প্রগতিশীল প্রার্থীরা সর্বোচ্চ ১৮০ ও সর্বনিম্ন ১৩৮ টি ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। বিরোধীরা পেয়েছেন সর্বোচ্চ ১১০ ও সর্বনিম্ন ২৬টি ভোট। প্রগতিশীলদের প্যানেল ভোট মোট ১১৫টি।

পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তনের পর থেকে স্বাস্থ্যভবনের এই ক্যান্টিনটি দখলের মরিয়া প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তৃণমূলীরা, কিন্তু সদস্যবন্ধুদের পাশে নিয়ে স্থানীয় নেতৃত্ব তাদের এই প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে সক্ষম থেকেছেন। মনে রাখা দরকার, এই ভবনেই স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ও আয়ুস মন্ত্রী অবস্থান করেন। সরকার পরিবর্তনের পর থেকে পূর্বতন পরিচালকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির ভুয়ো অভিযোগ এনেও তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা। পূর্বে এই ক্যান্টিন পরিচালনার জন্য কখনই নির্বাচন করার প্রয়োজন হয়নি। পূর্বতন পরিচালকমণ্ডলীতে তৃণমূল ফেডারেশনের নেতৃত্ব থাকলেও সুষ্ঠুভাবে ক্যান্টিন পরিচালনায় তাদের ভূমিকা ছিল নেতিবাচক। তাই-এবারে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে পরিচালকমণ্ডলী গঠনের পরিবর্তে প্রগতির শক্তি নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নেন। উদ্দেশ্য ছিল— তৃণমূলীদের মর্জির উপর নির্ভরতা নয়, সাহসের সঙ্গে নিজেদের যাচাই করা। বর্তমান পরিস্থিতিতে এ ধরনের ভাবনায় একাংশের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলেও নির্বাচনে লড়াই করার পক্ষেই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেই মোতাবেক, ছোট একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করে পরিকল্পিত উপায়ে তাঁরা সদস্যবন্ধুদের কাছে জনে জনে পৌঁছে যান। ভোটের আগের দিন অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরের তৃণমূল বিধায়ক মৃগেন মাইতির সাংগঠনিক কাজে স্বাস্থ্যভবনে আসা এবং ভোটের দিন বহিরাগতদের উপস্থিতিকে হেলায় উপেক্ষা করে সদস্যবন্ধুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটে অংশগ্রহণ করে তাঁদের মতামত দেন।

ক্যান্টিনের মোট ৯ জন কর্মচারীর জীবিকার ভবিষ্যত সুনিশ্চিত করা, সুলভমূল্যে কর্মচারীদের পরিষেবা প্রদান এবং সমবায় আন্দোলনকে পঙ্গু করে ফেলার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগঠনের সংহত রূপ এই জয় ছিনিয়ে আনতে পেরেছে। দেখা গেছে যে, স্বাস্থ্যভবনে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সমিতির কর্মী-নেতৃত্ব নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ব্যাপক জনসমর্থন পেয়েছেন।

২০০৪ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের সহযোগিতায় গড়ে ওঠা স্বাস্থ্যভবনের এই ক্যান্টিনকে প্রশাসনিক মদতে বেসরকারী হাতে তুলে দেওয়ার হীন প্রচেষ্টা; কর্মচারীদের একমাত্র ক্লাব-লাইব্রেরীটিকে অন্যায়ভাবে বন্ধ করে রাখা; আমাদের রাজ্যে গণতন্ত্রের ওপর লাগাতার আক্রমণ; শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি; সরকারী কর্মচারীদের তীব্র বঞ্চনা; বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না করা; লুম্পেনদের হাতে রাজ্যের ভবিষ্যত তুলে দেওয়ার সংস্কৃতি— ইত্যাদির বিরুদ্ধে কর্মচারীদের ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে স্বাস্থ্যভবনের ক্যান্টিন নির্বাচনে। সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে এই রায় সংগঠনের কাছে পাথেয় হয়ে থাকবে। প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সরাসরি মোকাবিলা করাই হল এইসময়ের একমাত্র পথ। □

নিজস্ব সংবাদদাতা

ধর্মভিত্তিক জনগণনা প্রতিবেদন ২০১১

প্রচার ও বাস্তব চিত্র

সুমিত ভট্টাচার্য

গত ২৫ আগস্ট ২০১৫, কেন্দ্রীয় রেজিস্ট্রার জেনারেল এবং জনগণনা সংক্রান্ত কমিশনারের দপ্তর ২০১১ সালের ধর্মীয় সম্প্রদায় ভিত্তিক জনগণনা সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করে। ২০১১ সালেই সে কাজ সম্পন্ন হয়েছে, তা এতদিন প্রকাশ না করে, হঠাৎ করেই এই সময়ে কেন প্রকাশ করা হল তাও কিছুটা ভেবে দেখার মত বিষয়তো বটেই। জনগণনা সংক্রান্ত যে কোন রিপোর্ট মূলত পরিসংখ্যানভিত্তিক। স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মীয় সম্প্রদায়- ভিত্তিক রিপোর্ট বা প্রতিবেদনও কোন ব্যতিক্রমী বিষয় নয়। কিন্তু এবারের প্রতিবেদন প্রকাশের সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারেরই সম্প্রচার বিভাগ পরিসংখ্যানের সাথে সাথে কিছু ব্যাখ্যাও হাজির করল, যা ব্যতিক্রমী ঘটনা। এই ব্যতিক্রমী ঘটনা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যখন দেখা যায়, একে কেন্দ্র করে হিন্দুত্ববাদী কয়েকটি সংগঠন ধর্মীয় বিদ্বেষ মেশানো প্রচার শুরু করে। অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই, মিডিয়ার একাংশের দায়িত্বজ্ঞানহীন ভূমিকা হিন্দুত্ববাদীদেরই উৎসাহিত করেছে।

একথা বলা বাহুল্য যে, ধর্মীয় মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন কোন সংগঠন যখন কোন বিশেষ ধর্মকে লক্ষ্য করে বিদ্বেষমূলক প্রচার শুরু করে, তখন সেই প্রচারকে ক্ষুরধার করার জন্য প্রাপ্ত তথ্যকে আড়াল করা হয়, বিকৃত করা হয়, এমনকি তথ্য-ভিত্তিই নেই এমন অবাস্তব কথাও প্রচার করা হয়। আলোচ্য ধর্মীয় সম্প্রদায় ভিত্তিক পরিসংখ্যানকে কেন্দ্র করে হিন্দুত্ববাদীদের প্রচারে এইসব নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিই রয়েছে। কিভাবে— তা দেখার আগে আলোচনার সুবিধার জন্য যে পরিসংখ্যানগুলি কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশ করেছে তাতে একবার চোখ বোলানো প্রয়োজন। তাহলেই পরিসংখ্যান কি বলছে, আর হিন্দুত্ববাদীরা কি বলছে এবং এই দুইয়ের মধ্যে সাযুজ্যই বা কতটুকু তা বিচার করতে আমাদের সুবিধা হবে। হিন্দুত্ববাদীদের প্রকৃত উদ্দেশ্যটাও ধরা পড়ে যাবে।

২০১১ সালের ধর্মীয় সম্প্রদায়ভিত্তিক জনগণনার প্রতিবেদন বলছে— আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার (১২১.০৯ কোটি) ৭৯.৮ শতাংশ হিন্দু (সংখ্যা ৯৬.৬৩ কোটি), ১৪.২ শতাংশ মুসলিম (সংখ্যা ১৭.২২ কোটি), ২.৩ শতাংশ খ্রিস্টান (সংখ্যা ২.৭৮ কোটি), ১.৭ শতাংশ শিখ (২.০৮ কোটি), ০.৭ শতাংশ বৌদ্ধ (০.৮৪ কোটি), ০.৪ শতাংশ জৈন (০.৪৫ কোটি), ০.৭ শতাংশ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী (০.৭৯ কোটি) এবং কোন ধর্ম জানাননি এমন মানুষের সংখ্যা ০.২ শতাংশ (০.২৯ কোটি)। এই পরিসংখ্যানগুলির সাথে আরও যে তথ্যগুলি ঐ প্রতিবেদনে পরিবেশিত হয়েছে তা হল, ২০০১-১১-র দশকে মোট জনসংখ্যার হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত ০.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। শিখ জনসংখ্যার অনুপাত হ্রাস পেয়েছে ০.২ শতাংশ এবং বৌদ্ধ জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ০.১ শতাংশ। খ্রিস্টান ও জৈন সম্প্রদায়ের অংশ মোট জনসংখ্যার অনুপাতে লক্ষণীয় তেমন কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি। একমাত্র মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে ০.৮ শতাংশ হারে। এই যে পরিসংখ্যান, যেখানে দেখা যাচ্ছে মোট জনসংখ্যায় একমাত্র মুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনুপাত সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে, একে কেন্দ্র করেই হিন্দুত্ববাদীরা লম্ফ-ঝম্ফ শুরু করে দিল। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা প্রবীণ তোগাড়িয়া, ভারতীয় জনতা পার্টির লোকসভার সদস্য সাক্ষী মহারাজ সহ সঙ্ঘ পরিবারভুক্ত আরও অনেকেই গেল গেল রব তুললেন। এঁরা বিদ্বেষমূলক প্রচারে যে কথাটা বার বার বলতে শুরু করলেন তা হল, এখনই মুসলিম পরিবারগুলির ওপর সরকারী ফতোয়ার মাধ্যমে সর্বাধিক দুটি সন্তানের বিধি-নিষেধ চাপিয়ে দিতে হবে। অথচ কিছুদিন আগে এই সাক্ষী মহারাজই হিন্দু রমণীদের চারটি করে সন্তানের জননী হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ পরিচালিত বিহারের দুর্গাবাহিনীতো এমন কথাও বলল, এখনি ধর্মীয় সম্প্রদায়ভিত্তিক জনগণনার সর্বনাশা প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করে বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু করে দেওয়া উচিত। দুর্গা বাহিনীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এতদিন পরে ঠিক এই সময়েই ধর্মভিত্তিক জনগণনা পরিসংখ্যান প্রকাশের আসল লক্ষ্য বিহারের বিধানসভা নির্বাচন। কারণ বিহারের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সঙ্ঘ পরিবারের সামগ্রিক প্রচারের স্পষ্টতই দুটি মুখ। একদিকে উন্নয়নের বুলি আওড়ানো, অপরদিকে তীব্র হিন্দুত্ববাদী প্রচারের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটানো।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল, ধর্মভিত্তিক জনগণনার প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও, ঐ একই সময়ে জাতিভিত্তিক যে জনগণনা করা হয়েছিল তার প্রতিবেদন কিন্তু প্রকাশ করা হচ্ছে না। কেন? — এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন সূত্র থেকে যা জানা যাচ্ছে, তা হল, ওবিসি এবং তপশিলী জাতির মধ্যেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী। একই সময়ে দুটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শুধুমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়কে দায়ী করা প্রবীণ তোগাড়িয়া বা সাক্ষী মহারাজের পক্ষে সম্ভব হত না। তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচারের মধ্য দিয়ে হিন্দু ভোটের মেরুকরণ ঘটানোর অপচেষ্টাও কিছুটা দুর্বল হত। বিহার নির্বাচনের আগে এই ঝুঁকি নিতে চায়নি নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় শাসক দল।

ধর্মভিত্তিক জনগণনার প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে সঙ্ঘ পরিবারের উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচার, শুধুমাত্র সত্যকে আড়াল করছে তা-ই নয়, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক প্রবণতাকেও লঘু করে দিতে চাইছে। উক্ত জনগণনা প্রতিবেদনের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করার জন্য এগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। যেমন, প্রথম ইতিবাচক প্রবণতা হল, ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুতলয়ে হ্রাস পাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসের প্রবণতা হিন্দুদের তুলনায় (৩.৫ শতাংশ) মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশি (৪.৯ শতাংশ)। প্রবীণ তোগাড়িয়া বা সাক্ষী মহারাজ সব জেনেও এই সত্যকে আড়াল করছেন। তৃতীয় ইতিবাচক দিক হল, উত্তরপ্রদেশ বা বিহারের মত জনবহুল রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় কম। চতুর্থত, সারা দেশেই পুরুষ অনুপাতে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পঞ্চমত, পুরুষ অনুপাতে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার হিন্দুদের তুলনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকটাই বেশি। দুরাত্মার যেমন ছলের অভাব হয় না, ঠিক তেমনই হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী সঙ্ঘ পরিবারের প্রচারকরা উপরোক্ত ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বেমালুম চেপে গিয়ে, এক দশক (২০০১) আগের জনগণনা প্রতিবেদনের ওপর প্রচারের সার্চ লাইট ফেলতে চাইছে। যেখানে বলা হয়েছিল এক দশকে মুসলিম জনসংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯১-এর তুলনায় ২০০১-এ মুসলিম জনংসখ্যা এক লাফে অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল কারণ ১৯৯১ সালের জনগণনায় মুসলিম অধ্যুষিত জম্মু ও কাশ্মীরকে বাদ রাখা হয়েছিল। ২০০১ সালের জনগণনায় জম্মু ও কাশ্মীরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ফলস্বরূপ মুসলিম জনসংখ্যা এক লাফে অনেকটাই বৃদ্ধি পায়।

সঙ্ঘ পরিবারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সাম্প্রদায়িক জিগিরে প্রভাবিত না হয়ে, যদি বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জনগণনার পরিসংখ্যানগুলিকে বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে কয়েকটি আর্থ-সামাজিক সূচক হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা ও হারকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ধর্মীয় পরিচিতি এক্ষেত্রে কোন বিষয়ই নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কেরালা ও উত্তরপ্রদেশে বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জনংসখ্যা বৃদ্ধির হার এক নয়। এর কারণই হল ঐ দুটি রাজ্য শিক্ষার প্রসার ও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামোর মাপকাঠিতে, এক জায়গায় নেই। অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যেমন ২০১১-র আলোচ্য ধর্মভিত্তিক জনগণনা পরিসংখ্যানে দেখা যায় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক অনুপাত অত্যন্ত উন্নত। যেমন, প্রতি ১০০০ পুরুষে নারীর সংখ্যা ১০২৩। অথচ পাঞ্জাব বা হরিয়ানায় বসবাসকারী খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লিঙ্গভিত্তিক অনুপাত কিন্তু অনেকটাই খারাপ।

তবে একথা অনস্বীকার্য, কয়েক দশক ধরে চলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী অনেকটাই ফলদায়ী হয়েছে। প্রতি সন্তানধারণক্ষম (বয়সের বিচারে) নারী পিছু সন্তান সংখ্যার জাতীয় গড় ক্রমান্বয়ে নিম্নাভিমুখী। ২০১৩ সালে এই গড় নেমে এসে দাঁড়িয়েছে ২.১-তে। এই সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের অভিমত হল, একটি ইতিবাচক এবং একটি নেতিবাচক কারণ এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল। ইতিবাচক কারণটি হল পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নেতিবাচক কারণটি হল, ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করে তাকে হত্যা করার প্রবণতা। প্রসঙ্গক্রমে যা উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জনংসখ্যার লিঙ্গভিত্তিক অনুপাত (প্রতি ১০০০ পুরুষে ৯৫১ জন নারী) হিন্দুদের তুলনায় (প্রতি ১০০০ পুরুষে ৯৩৯ জন নারী) যে বেশি তার কারণই হল মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কন্যা ভ্রূণ হত্যা করার মতন অপরাধমূলক কুপ্রথা চালু নেই। সাচার কমিটির রিপোর্টেও এই কথা বলা হয়েছে। নারীর সন্তান ধারণের সক্ষমতা বা তাগিদের সাথে ধর্মের যে কোন সম্পর্ক নেই, তার দুটি মস্ত বড় উদাহরণ হল পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। ঐ দুটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশেই প্রতি নারী পিছু গড় সন্তান সংখ্যা আমাদের দেশের তুলনায় কম।

মধ্যপ্রদেশে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একত্রে অংশগ্রহণ করেছেন হিন্দু ও মুসলিম রমণীরা।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী আমাদের দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অনেকাংশে সফল হয়েছে, তা অনস্বীকার্য হলেও এর অসম্পূর্ণতার দিকটিও উল্লেখের দাবি রাখে। ১৯৯৪ সালে কায়রোতে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছিল তাতে আমাদের দেশ থেকেও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ঐ সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে যে আহ্বান রাখা হয়েছিল তা হল, 'উন্নয়নই হল সর্বশ্রেষ্ঠ গর্ভনিরোধক বড়ি।' কিন্তু এর মর্মার্থকে কার্যকরী করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আমাদের দেশের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে অনুপস্থিত। এখানে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে শুধুমাত্র সংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করার ওপর জোর দেওয়া হয়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে জুড়ে এই পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রয়াস সরকারী স্তরে তেমনভাবে নজরে পড়ে না।

সন্তান সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের প্রবণতা সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মহিলাদের মধ্যেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিন্দুত্ববাদীরা জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটছে বলে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মিথ্যার বেসাতি করে, অথচ তারা একথা বলে না যে স্বাস্থ্য খাতে সরকারী বরাদ্দের স্থিতাবস্থা, নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দ ছাঁটাই এবং সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিষয়ক দপ্তরের বরাদ্দ বৃদ্ধি না করার ফলে প্রসূতি মায়েদের মধ্যে (ধর্ম নির্বিশেষে) রক্তাল্পতাজনিত সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হল সমাজের বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া অংশের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি। জানুয়ারি ২০১৫-তে এই সংক্রান্ত একটি গবেষণাধর্মী রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছে 'ইউনাইটেড স্টেট্স্ ইন্ডিয়া পলিসি ইনস্টিটিউট অ্যাণ্ড সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যাণ্ড ডিবেটস্ ইন ডেভেলপমেন্ট পলিসি।' এই রিপোর্টের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল— প্রথমত, সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের (সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় সহ) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারী বরাদ্দের পরিমাণ অপ্রতুল। আবার জনশিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, নারী ও শিশুকল্যাণ, জনস্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে যা বরাদ্দ করা হয়, তারও সবটুকু সঠিকভাবে ব্যয় করা হয় না। দ্বিতীয়ত, এছাড়াও রয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য। জাতি ও ধর্মভিত্তিক পরিচিতির নিরিখে জনসাধারণের একাংশ এই বৈষম্যের শিকার হন। বহুল আলোচিত বিচারপতি রাজিন্দর সাচার কমিটির রিপোর্টেও মুসলিম সম্প্রদায় এবং তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের দুর্দশার পেছনে ঐ একই কারণগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাচার কমিটির রিপোর্টে এমনকি একথাও বলা হয়েছে, শিক্ষা-আয়-কাজের সুযোগ-স্বাস্থ্য প্রভৃতি সূচকের নিরিখে মুসলিম সম্প্রদায় তপশিলী জাতি ও উপজাতিদেরও পিছনে পড়ে রয়েছে। কিন্তু হিন্দুত্ববাদীরা একথা কখনও প্রচার করে না।

প্রকৃত অর্থেই মুসলিম সম্প্রদায় কি অবস্থার মধ্যে রয়েছে তা বোঝার জন্য আরও দু-একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। যেমন— (১) মুসলিম জনসংখ্যার বৃহদংশই বাস করেন গ্রামাঞ্চলে। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণেই এঁদের শহরাভিমুখী গতিশীলতা কম। (২) মাসিক ভোগব্যায়ের নিরিখে দারিদ্র্য পরিমাপের যে মাপকাঠি, তাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থান সর্বনিম্ন। (৩) বিভিন্ন ধরনের কাজে যুক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের উপস্থিতি সর্বনিম্ন, এবং (৪) এমনকি শহরাঞ্চলে বেতনভুক কর্মচারীদের মধ্যেও মুসলিম সম্প্রদায়ের উপস্থিতির চিত্র এইরকম হতাশাব্যঞ্জক।

এতকিছু 'নেতি'র মধ্যে একটাই তথ্য রীতিমত চমকে দেবার মত। স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং নিম্ন আয়ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম সম্প্রদায়ে শিশু মৃত্যুর হার হিন্দুদের তুলনায় অনেকটাই কম। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর মৃত্যুর হার হিন্দুদের তুলনায় ১৮ শতাংশ কম। এর অর্থ প্রতি ১০০ জন শিশুর মধ্যে হিন্দু পরিবারের যতজন শিশু পাঁচবছর বয়স অতিক্রম করে, তার থেকে ১.৭ জন বেশি মুসলিম শিশু পাঁচ বছর বয়সের পরেও বেঁচে থাকে। পরিশেষে বলা যায়, মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রকৃত অবস্থা ও হিন্দুত্ববাদীদের প্রচারে আসমানজমিন ফারাক রয়েছে। আসলে 'ঘর ওয়াপসি', 'লাভ জিহাদ' বা গরুর মাংসের মতই ধর্মভিত্তিক জনগণনা প্রতিবেদনকে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের লক্ষ্যে। যা অবিলম্বে প্রতিহত করা জরুরী। □

শোক সংবাদ

পীযূষ গাঙ্গুলি

মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় নিহত হলেন বাংলা চলচ্চিত্র, সিরিয়াল ও থিয়েটারের বলিষ্ঠ অভিনেতা পীযূষ গাঙ্গুলি। ২৪ অক্টোবর রাত ২.৫৫ মিনিটে মধ্য কলকাতার একটি বেসরকারী চিকিৎসাকেন্দ্রে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত ২০ অক্টোবর বিকালে সাঁতরাগাছি ব্রীজের ওপর একটি বাসের সঙ্গে তাঁর গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মারাত্মকভাবে জখম হয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সম্ভাবনাময় এই শিল্পীর আকস্মিক প্রয়াণে শোক জানিয়েছেন অভিনেতা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সব্যসাচী চক্রবর্তী প্রমুখ। শোক ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা শ্যামল চক্রবর্তী, গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সংঘ ও গণনাট্যের নেতৃবৃন্দ।

পীযূষ গাঙ্গুলি একাধিক ছায়াছবিতে অভিনয় করেছেন। বেশ কয়েকবার তিনি অভিনয়ের জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন। 'জলনূপুর' ও 'চোখের তারা' টেলি সিরিয়ালে তিনি অভিনয় করেছিলেন। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি সুগায়ক ছিলেন। বিভাস চক্রবর্তী ও বিপ্লব কেতন চক্রবর্তীর হাত ধরে বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ। প্রচুর থিয়েটারে অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে। বহু প্রশংসিত নাটক নিভা আর্টসের 'গ্যালিলেও গ্যালিলাই' তাঁর শেষ মঞ্চাভিনয়। □

উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সুতপা হাজরা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। উগ্র হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ দ্বারা পরিচালিত একটি সংগঠন। জন্মলগ্ন থেকেই এদের লক্ষ্য ভারতবর্ষে হিন্দু রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে উত্তাল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময়েও, এরা গোপনে এই লক্ষ্যেই কাজ করেছে, এমনকি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেও সহায়তা করেছে। স্বাধীনতার পরেও বিভিন্ন শাখা সংগঠন গড়ে তুলে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এই লক্ষ্যেই কাজ করে চলেছে। বর্তমানে ক্ষমতায় আসীন ভারতীয় জনতা পার্টি আর এস এস-এর রাজনৈতিক শাখা। নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা থাকার ফলে বিপুল তৎপরতায় আর এস এস-র কর্মসূচীকে কার্যকরী করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে হিন্দুত্ববাদীদের হাতে শাসন ক্ষমতা এক ভয়াবহ ইঙ্গিত বহন করে।

এই আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠা হয় নাগপুরে ১৯২৫ সালের বিজয়া দশমীর দিন। হেডগেওয়ারের নেতৃত্বে নাগপুরে একখণ্ড জমিতে কিশোর ছেলেদের খেলার মাঠ আর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। ঐ জমির উপরেই রয়েছে বর্তমান আরএসএস-এর প্রধান দপ্তর 'হেডগেওয়ারের ভবন'টি। এই হেডগেওয়ারই ১৯২৬-এর রামনবমী দিন। এজন্যই রামনবমীর দিনটি আরএসএস-এর কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। প্রথম থেকেই হেডগেওয়ার সংগঠনের ছেলেদের এমনভাবে মগজ ধোলাই করেছিলেন যে তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠতম হিসাবে গণ্য করতে শুরু করে এবং গড়ে ওঠে এভাবেই যে নেতার জন্য সবকিছু করতেই তারা প্রস্তুত। তাই অন্যের বক্তব্যকে মান্য করা, শ্রদ্ধা করা তো দূরের কথা-- শোনবার মতো ধৈর্যও তাদের তৈরি হল না। যদিও আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠা লগ্নে এই সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন হেগড়েওয়ার ছাড়াও এবিএম মুঞ্জে, ডঃ এলভি পরাঞ্জপে, ডঃ বি বি পলকর এবং বাবুরাও সাভারকর।

আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগে গোটা দেশে জাতীয় আন্দোলন যখন তুঙ্গে সেই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রচ্ছন্ন মদতে এবং ইতালির ফ্যাসিবাদী শক্তির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের জন্ম। খিলাফৎ আন্দোলন যখন তুঙ্গে, অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগসূত্র যখন আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে, সাম্রাজ্যবাদের ভিতকে আলগা করে দিচ্ছে তখনই দেখা যাচ্ছে এমনকিছু ব্যক্তি যারা কোহট, বান্নু, মদলতাল, নাগপুর, কানপুর ইত্যাদি জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করে দিচ্ছে। সেইসব ব্যক্তিরাই পরবর্তী সময়ে আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে কিংবা পরবর্তীতে আরএসএস-এর সক্রিয় কর্মী হিসাবে আত্মনিয়োগ করছে। দেশে তখন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব ক্রমশ প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে, সাইমন কমিশন গঠনের পূর্বাভাষ পাওয়া যাচ্ছে। এখবর আগেই জানতে পেরে কমিশন গঠনের কয়েকমাস আগে লাঠি, তরবারি, বর্শা সহযোগে আরএসএস তাদের প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা করে। উদ্দেশ্য ব্রিটিশ তোয়াজ করা, স্বদেশী ও মুসলমান মারা। প্রথম থেকেই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার লক্ষ্যকে স্থির রেখে মানুষকে তারা বরাবর বিভ্রান্ত করেছেন। স্বয়ংসেবক মানে সমাজ সেবক এটা প্রথম থেকে তুলে ধরা হয় কিন্তু এই স্বয়ংসেবক শব্দটির আড়ালে যে কী বীভৎস সাম্প্রদায়িক কদর্যতা লুকিয়ে আছে তা বিভিন্ন ঘটনায় প্রমাণিত। আরএসএস-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুঞ্জে ইতালির ফ্যাসিস্ট নেতা মুসোলিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কারণে ফ্যাসিস্ট আদর্শ আরএসএস-এর উপর আরোপ করেছিলেন। তাই এদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 'বিদ্যাভারতী'তে শিশু কিশোরদের শরীরচর্চার সঙ্গে আধা সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যা মূলত ফ্যাসিস্ট সংগঠনগুলি থেকে ধার করা। এই সময়ে মহারাষ্ট্রের পরিধির বাইরে হিন্দি বলয়ে আরএসএস-এর সদস্য সংখ্যা বড়রকমে বৃদ্ধি পায়। যদিও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণরাই সংগঠনের নেতৃত্বে থাকে।

ভারতীয় জাতির যে চিন্তাভাবনার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী চিন্তাকে সম্বল করে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় আগ্রাসন শুরু করে দেয় হিন্দু সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তি। তিরিশের দশকের শেষভাগ থেকেই আরএসএস ও তার শাখা সংগঠনগুলিও তাদের রাজনৈতিক সংগঠন হিন্দু মহাসভা বলতে শুরু করে— ভারতবর্ষে সংখ্যালঘুদের অধিকার নির্ভরশীল থাকবে সংখ্যাগুরুদের মহানুভবতার উপর। এই ধারণার অক্টোপাসেই হিন্দু মহাসভার পরিবর্তিত সংস্করণ ভারতীয় জনতা পার্টি বেঁধে ফেলতে চাইছে গোটা ভারতবর্ষকে, গণহত্যার তাণ্ডব চালিয়েছে গুজরাটে। হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির এই আগ্রাসনে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ব্যাপকভাবে উৎসাহিত হয়। মুসলিম লীগ এই সুযোগে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বড়রকম প্রসারের সুযোগ পায়।

তিরিশের দশকের সূচনা পর্ব থেকেই ধীরে ধীরে বামপন্থী গোষ্ঠীগুলির উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ দেশের জাতীয় আন্দোলনে একটা নতুন মাত্রার সংযোজন করে। ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর সংঘটিত সোভিয়েত বিপ্লব গোটা বিশ্বের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা, এই ঘটনার জোয়ার এসে লাগল ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রেও। বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপিনচন্দ্র পাল ১৯১৯ সালে লিখলেন, ''আজ জার্মান সমরবাদের পরাজয়ের পর, জারের স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হওয়ার পর গোটা বিশ্বজুড়ে এক নূতন শক্তির উদ্ভব হয়েছে, জনগণের শক্তি। এই শক্তি নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার— সম্পত্তিবান ও তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর দ্বারা শোষিত ও নির্যাতিত না হয়ে, স্বাধীনভাবে বাস করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ''। ১৯২৭ সালের পর থেকে গোটা দেশজুড়ে ক্রমশ গড়ে উঠতে শুরু করেছে ছাত্র ও যুব সংগঠন। জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু গোটা দেশজুড়ে সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্রকে আক্রমণ করে সমাজতন্ত্রের মতাদর্শ প্রচার করলেন। চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিংহ প্রমুখেরা সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকলেন, এই ঘটনা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেও একটা বড়রকমের ধাক্কা দিল। দেশের জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজির ব্যাপক প্রভাব ও জনপ্রিয়তা, বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধিতে ব্রিটিশরা একটা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের পূর্বাভাষ পাচ্ছিল। তাই সহজেই তারা দুধ-কলা দিয়ে বড় করে তুলছিল আরএসএস-রূপী কাল সাপকে। এই সময়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সংহত করে, তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে একই সঙ্গে কংগ্রেস ও বামপন্থীদের মোকাবিলা করার কাজে নিজেকে নিয়োগ করলেন ভি ডি সাভারকর। লিনলিথগো ভাইসরয় থাকাকালীন সাভারকর সম্পর্কে যে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন সে সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ রয়েছে। সাভারকর জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য দেওয়া মুচলেকা অনুসরণ করে ১৯৩৯ সালের ৯ অক্টোবর তৎকালীন ভাইসরয় লিনলিথগোর সঙ্গে আলোচনা করেন। লিনলিথগো লিখছেন, 'সাভারকর আমাকে জানালেন, পরিস্থিতি এমন হয়েছে যার ফলে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে হিন্দুদের দিকে উদারভাবে হাত বাড়িয়ে দেওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন। আমাদের সঙ্গে হিন্দুদের সম্পর্ক অবশ্য অতীতে ভালো ছিল না। তবে এমন অম্লমধুর সম্পর্ক তো ব্রিটেনের সঙ্গে ফ্রান্স, জার্মানি বা রাশিয়ারও ছিল। সাভারকরের মতে হিন্দুদের স্বার্থ ও আমাদের স্বার্থ অভিন্ন। তাই তাদের সঙ্গে আমাদের মিলেমিশেই কাজকর্ম করা একান্তভাবে জরুরি হয়ে উঠেছে। এই ক্ষেত্রে সবথেকে জরুরী বিষয় হল, ব্রিটিশদের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদীদের বন্ধুত্বে অতীতে কী ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে সেইসব প্রসঙ্গ এখন ভুলে যাওয়াই দরকার। সাভারকর আমাকে বললেন যে, তারা যুদ্ধের শেষে ডোমিনিয়ন স্টেটাস মেনে নিতে এককথায় প্রস্তুত রয়েছেন। কংগ্রেসকে কারও প্রতিনিধি হিসাবেই সাভারকর মেনে নিতে চান না। অর্থাৎ মনে হয় ডোমিনিয়ন স্টেটাস নিয়ে যাবতীয় আলাপ আলোচনা আমরা কেবলমাত্র হিন্দুত্ববাদীদের সঙ্গেই করি— এমনটাই বোধহয় সাভারকরের মনের ইচ্ছে।' (India office (IO) Mss Enr F 12518, 1939, Letters to the Secretary of State for India : the letter is dater Oct 7, bee the

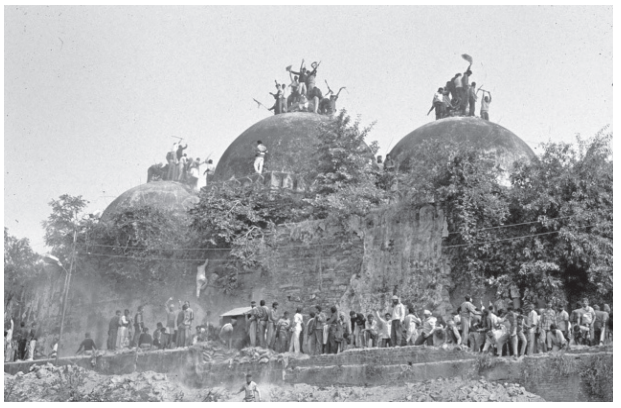

report of the meeting is in the Postscript on Oct. 9). সাভারকরের এই জাতীয়তাবাদ বিরোধী প্রবল হিন্দুত্বের আগ্রাসনের সুযোগ মুসলিম লিগ তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বড়রকমের প্রসারের সুযোগ পেয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের প্রতিনিধি রেজিনাল কপল্যাণ্ডের সঙ্গে হিন্দু মহাসভা প্রসঙ্গে আলোচনাকালে জিন্না বলেছেন 'সাভারকর ব্রিটিশদের কাছে নিজেকে কংগ্রেস ভাইদের থেকেও অনেক বেশি পরিমাণে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন। এই ব্যাপারটি কিন্তু অনেক বেশি সূক্ষ্ম এবং মারাত্মক।' জিন্নার এই আতঙ্ক থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, কেন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এমনকি ১৯৪০ সালের মার্চে লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে জিন্না বলতে বাধ্য হলেন, ''ভারত ক্রমশ হিন্দু-ভারত আর মুসলিম ভারতে ভাগ হয়ে আসছে।'' প্রকৃতপক্ষে দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলনকে সবদিক থেকে ছুরি মারার সব ধরনের ষড়যন্ত্র তারা করেছে।

নাগপুরে দাঙ্গায় ১৯২৭ সালে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে আরএসএস-এর ভারতীয় সমাজ জীবনে ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ ও প্রাদেশিকতার বিষ রোপণের সূচনা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্ররোচনা দেওয়ার যে কার্যক্রম জন্মলগ্ন থেকেই আরএসএস আয়ত্ত করেছিল সেই কার্যক্রম কিন্তু তাদের এখনও বহাল আছে। ভারতের স্বাধীনতা-উত্তর সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আরএসএস প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছে, অংশগ্রহণ করেছে তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে ব্যাতায়তিল, ভেণুগোপাল এবং রেড্ডি কমিশনের প্রতিবেদনে। এই দাঙ্গাগুলিতে আরএসএস মূলত নিজেদের যে পরিচয় রেখেছে তা হল মুসলমান, খ্রিস্টান নির্বিশেষে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা। দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। এই বদমায়েশির পিছনে যুক্তি খাড়া করতে আরএসএস স্বামী বিবেকানন্দকেও বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করতে কিছু মাত্র দ্বিধা করে না, যদিও বিবেকানন্দের ধর্মবোধের সঙ্গে আরএসএস-এর চিন্তাভাবনার আদৌ কোন সাদৃশ্য নেই। এই আরএসএস-রই সক্রিয় কর্মী ছিল গান্ধী হত্যাকারী নাথুরাম গডসে। ১৯৩০ সালে আরএসএস-এ যোগদানের পর থেকেই সাভারকর ও হেডগেওয়ার নাথুরামকে সঙ্গে নিয়ে গান্ধী হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এখানে আরএসএস ও তাদের রাজনৈতিক সংগঠন হিন্দু মহাসভা কৌশলগত কিছু ভূমিকা পালন করে, নিজেদের মধ্যে যুক্তি পরামর্শ করেই ১৯৪০ সালে নাথুরাম আরএসএস-এর সঙ্গে লোক দেখানো সম্পর্ক ত্যাগ করে হিন্দু মহাসভাতে যোগ দেয়। আরএসএস আজ নিজেদের পিঠ বাঁচাতে নাথুরামকে নিজেদের লোক বলে অস্বীকার করলেও, নাথুরামের ভাই গোপাল গডসে ১৯৯৩ সালে প্রকাশ্যে আরএসএস-এর সঙ্গে তাঁর এবং নাথুরামের সক্রিয় ঘনিষ্ঠতার কথা স্বীকার করেন (দি স্টেটসম্যান, ১৪.১২.৯৩)। অবশ্য বর্তমানে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আসার পর আরএসএস লাজ লজ্জা সব ভুলে নাথুরামকে দেশপ্রেমিক হিসাবে প্রচার করে তার মূর্তি নিয়ে মন্দির বানিয়ে গান্ধীজির-ই মৃত্যুদিনে তা উদ্বোধন করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে!!

ইতালির ফ্যাসিবাদী শক্তির প্রভাব এবং উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার মেলবন্ধনে তৈরি আরএসএস জন্ম থেকেই দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে এবং নিজেদের সাম্প্রদায়িক বক্তব্য ও কর্মের সমর্থনে নানা উদ্ভট ও আজগুবি যুক্তি খাড়া করে এসেছে যা একপ্রকার ভণ্ডামিরই নামান্তর। আরএসএস-এর সর্বোচ্চ নেতা গোলাওয়ালকার ১৯৩৮ সালে ৭৭ পৃষ্ঠার একটি বই লিখেছিলেন ''We on Our Nationhood defined''। বইটি আরএসএস-এর বাইবেল। যাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন হিন্দুস্থানে হিন্দুরাই বিরাজ করবে। অহিন্দুরা এদের দয়ার উপর নির্ভর করে থাকতে পারলে থাকবে আর যদি হিন্দুরা এদের তাড়িয়ে দিতে চায় তাহলে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যেতে হবে (গোলওয়ালকার ১৯৩৯, পৃষ্ঠা ৪৭)। তার আগেই ১৯২১-২২ সাল নাগাদ সাভারকর হিন্দু মতাদর্শের শক্ত ভিত দেওয়ার চেষ্টায় ''Essentials of Hindutva'' বইটি লেখেন। যাতে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন ''Hindutava is not a word but a history. Not only the spiritual and religious history of our people as at times it is mistaken to be by being confounded with the other cognate term Hinduism, but a history in full, Hinduism is only a derivative, a fraction, a part of Hindutva.'' অর্থাৎ হিন্দুধর্মের সঙ্গে হিন্দুত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। সাভারকরের মতে, হিন্দুত্ব আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সুষুম্নাকাণ্ডের মতো প্রবাহিত হচ্ছে।

সাভারকরের হিন্দুত্ব এজেন্ডা কিংবা গোলওয়ালকারের হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সাকার করাই আরএসএস-র নেতৃত্বাধীন সংঘ পরিবারের মূল লক্ষ্য। সেই পথে এগোতেই দু'দশক আগে বাবরি মসজিদকে মাটিতে লুটিয়ে দেওয়া, সেই পথে এগোতেই তার এক দশক পরে গুজরাট গণহত্যা— গুজরাটকে পরিণত করা হয়েছিল কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। তখন কেন্দ্রে অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন নরম হিন্দুত্ব মুখোশের এনডিএ সরকার। মুখোশের আড়ালে হিন্দুত্বের কর্মসূচী নির্মমভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছে আরএসএস। এখন আর সেই মুখোশের দরকার পড়ছে না। ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজেপি (সংঘের রাজনৈতিক শাখা) এখন একাই কেন্দ্রে সরকার গড়েছে। কোন আড়ালের দরকার নেই। প্রধানমন্ত্রিত্বে আসীন আরএসএস-এর প্রচারক। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতকে অসহিষ্ণু ফ্যাসিস্ট হিন্দুরাষ্ট্র বানাতে বদ্ধপরিকর সংঘ পরিবার। ভিএইচপি-র অশোক সিংঘল উবাচ— ''আট শতাব্দী পর ফের দিল্লীতে হিন্দু স্বাভিমানী ক্ষমতায় এসেছে।'' এমনকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং খুব স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আরএসএস-ই সরকার চালাচ্ছে, কারণ তিনি বা প্রধানমন্ত্রী উভয়েই আরএসএস-এরই ক্ষেতের ফসল।

বিগত এক বছরে ভারতের নব্য নাৎসিবাদী শক্তির ভীতিজনক প্রসার ঘটেছে। বিজেপি-সংঘ পরিবার পরিকল্পিত হিন্দুত্বের প্রচার ও প্রসার কোন ইতিবাচক সংস্কার বা জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির ও বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে ঘটানো হচ্ছে না, এটি ঘটানো হচ্ছে সম্পূর্ণ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। একথা প্রায়ই শোনা যায় ভারতের শাসককুল স্বাধীনতার পর থেকে মুসলিম তোষণনীতি নিয়ে চলেছেন, যা নাকি হিন্দুদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে একধরনের প্ররোচনাত্মক 'সংখ্যালঘুবাদ''-এর জন্ম দিয়েছে। বিজেপি-র এই প্রচারের পক্ষে ওকালতি করে চলেছেন রাজনীতি ক্ষেত্র ও প্রচার মাধ্যমের কিছু কর্তাব্যক্তিরা। হিন্দুত্বের এই অভিযান কেবলমাত্র মুসলিমদেরই বিরোধিতা করছে না, এটি প্রকৃতপক্ষে হিন্দু ঐতিহ্যের গৌরবময় নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী, এমনকি রামায়ণ, মহাভারতের মতো মহাকাব্যে যেসব শিক্ষণীয় বিষয় তুলে ধরা হয়েছে— এটি তারও বিরোধী। এই ধরনের প্রচারের মূল উদ্দেশ্য ভারতীয় গণতন্ত্রের বিকৃতিসাধন করে সেই জায়গায় মধ্যযুগীয় ধর্মভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন। একটি আধুনিক ও উন্নত ভারত গঠনের আশা-আকাঙ্ক্ষার বুকে এ এক নির্মম ছুরিকাঘাত। প্রচারের সঙ্গে সত্যতা মিলিয়ে দেখা যাক।

বিজেপি-র পেশ করা তত্ত্বের প্রধান কথা মুসলমানরা ভারতীয় জাতিসত্তার অঙ্গ নয়। তারা চিন্তা-চেতনায় এবং সংস্কৃতির দিক থেকে বিদেশী, এর সঙ্গে অবশ্য ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নেই। মুসলমানদের কথা বাদ দিলাম, দেশের সব হিন্দুরাও একই ধরনের আচার-বিচার, উপাসনা পদ্ধতি, দেবদেবীর আরাধনা বা শবদেহ সৎকার করেন না। এঁরা সকলে একই দেবতার উপাসক নন, এদের জাতপাতও আলাদা, এমনকি এরা একই ভাষায় সকলে কথাও বলেন না। অনুরূপভাবে মুসলিমদের বাইরে থেকে যতই একশ্রেণীভুক্ত দেখাক না, তাদের মধ্যেও বিভিন্নতা আছে। উপরন্তু আমাদের দেশে যে মিশ্র সংস্কৃতি আছে তাকে বিপথ গমন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, ফলে আকবর ও কবীরকে ভারতের ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই মুসলমানরা ভারতীয় হয়ে ওঠেননি বলে যে অভিযোগ তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। বরং আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের সকল ইতিবাচক স্রোতে অবগাহনের জন্য হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর প্রতি আহ্বান জানান উচিত। সংবিধানের ৩৭০ নং ধারা অনুযায়ী জম্মু ও কাশ্মীর কিছু বিশেষ সুবিধা পায়, যেখানে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু এ ব্যাপারে জম্মু কাশ্মীর একক নয়। সংবিধানের ৩৭১, ৩৭১ এ, ৩৭১ বি প্রভৃতি ধারা অনুযায়ী মহারাষ্ট্র, গুজরাট, নাগাল্যান্ড, আসাম, মণিপুর, সিকিম, মিজোরাম ও অরুণাচলও নানা ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। স্থানীয় অধিবাসী না হলে যেমন

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

জাতির মানসিক গঠনের উপর বিপজ্জনক প্রভাব পড়বে ঃ ইরফান হাবিব

গভীর পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ ছাড়াই, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার দেশের ইতিহাসের গৈরিকীকরণের যে সুবৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তা ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শনের কলঙ্কজনক অতীতকে মুছে ফেলে, এক কৃত্রিম গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে নির্মাণ করার অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনই অভিমত প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ইরফান হাবিবের।

গত কয়েকমাসে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার সঙ্ঘ পরিবারের হিন্দুত্বের কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটাতে শুরু করেছে। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদগণের অভিমত হল, স্বয়ংশাসিত সংস্থাগুলির (যেমন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টরিক্যাল রিসার্চ, দ্য নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এণ্ড লাইব্রেরী এবং ললিত কলা একাডেমি) ওপর কার্যত চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। যাতে সঙ্ঘ পরিবারের পছন্দসই বিষয়ের ওপরেই শুধুমাত্র গবেষণা করা হয়। বহু শিক্ষাবিদের দাবি হল, সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে বিভিন্ন বিষয়ে অন্যায্য ও অনৈতিহাসিক গবেষণাকে উৎসাহিত করছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও, বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলি এমন কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করছে, যেগুলি স্পষ্টতই প্রকৃতিগত ভাবে সংখ্যাগুরুবাদী। গো মাংস ভক্ষণের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপের উদ্যোগ, স্কুল পাঠ্যে গীতা ও রামায়ণের অন্তর্ভুক্তি বা ঔরঙ্গজেব নামাঙ্কিত রাস্তার নামের পরিবর্তন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বোঝা যায় বর্তমান সরকার 'হিন্দুত্ব'-এর প্রচার ও প্রসারে বিশেষ আগ্রহী। 'হিন্দুত্ব' সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করার ফলে, উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করে চলেছে। ভারতে বহুত্ববাদী সংস্কৃতির ওপর এই আক্রমণ এযাবৎকাল স্বীকৃত ইতিহাসের বি-নির্মাণের অশুভ উদ্যোগ। স্বভাবতই সঙ্ঘ পরিবারের কাছে এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হল, বিদ্যালয় স্তরে পাঠ্য বইগুলিকে নতুন করে লেখা। প্রথম এন ডি এ সরকারও ১৯৯৮ সালে ক্ষমতায় এসেই, হিন্দুত্ববাদী তাত্ত্বিকদের দায়িত্ব দিয়েছিল পেশাদার ঐতিহাসিকদের পরিশ্রমসাধ্য ও গবেষণালব্ধ ইতিহাসকে বাতিল করে, নতুন করে ইতিহাস লেখার জন্য। ঐতিহাসিক ও অন্যান্য শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় 'হিন্দুত্ব' শুধুমাত্র আবিশ্ব স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী অনুসন্ধানের ধারাটিকেই বাতিল করবে না, ভিত্তিহীন অসত্য তত্ত্বের ভিত্তিতে ইতিহাসের সাম্প্রদায়িকীকরণের কাজকেও সম্পন্ন করবে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইতিহাসবিদ এবং বর্তমানে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এমিরেটাস অধ্যাপক ইরফান হাবিব জানালেন, কিভাবে গবেষণালব্ধ ইতিহাসের বিভিন্ন ফলাফলকে কোন বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রাপ্ত প্রমাণাদি ছাড়াই অহরহ পরিবর্তন করে ফেলা হচ্ছে।

অশীতিপর এই ইতিহাসবিদ তাঁর সমগ্র কর্মজীবনে বরাবরই সমস্ত ধরনের ধর্মীয় মৌলবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। এমনকি সম্প্রতি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কে সংখ্যালঘুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের দাবিটিরও তিনি বিরোধিতা করেছেন। তাঁর রচিত বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে 'মুঘল ভারতে কৃষিব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭)' নামক গ্রন্থটি গত পাঁচ দশক ধরে ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে মুঘল ভারত সম্পর্কিত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনা হিসেবে আদৃত। পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত অধ্যাপক ইরফান হাবিব মহাশয় বহুবছর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টরিক্যাল রিসার্চের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্র ঃ বর্তমান রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি থেকে একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, বর্তমান বি জে পি নেতৃত্বাধীন সরকারের লক্ষ্য হল ভারতের ইতিহাসের পুনর্ব্যাখ্যা। এই কাজে যে যে ক্ষেত্রগুলিকে এরা বিশেষ জোর দিতে চাইছে তা হল, বৈদিক যুগের বিভিন্ন দিক, আর্যদের প্রসঙ্গ, দিল্লীর সুলতানি আমল, মুঘল সাম্রাজ্য এবং হিন্দু মহাকাব্যগুলি। উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়কে নিয়েই পেশাদার ইতিহাসবিদগণ বহুদিন ধরে গবেষণা ও চর্চা করে চলেছেন। তাহলে এই নব উদ্যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি বলে আপনার মনে হয়?

ইরফান হাবিব ঃ আমি বর্তমান সরকারের কিছু নেতার কয়েকটি 'ঐতিহাসিক' ঘোষণা পড়েছি। এগুলির শীর্ষে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দাবি, যে ভগবান গণেশের হাতির মাথা প্রমাণ করে সুপ্রাচীন ভারতেই প্লাস্টিক সার্জারি আবিষ্কৃত হয়েছিল। সমপর্যায়ের মেধাজাত বেশ কিছু উক্তি ঐ মন্ত্রিসভার আরও অনেকেই করেছেন। আই সি এইচ আর-এর বর্তমান চেয়ারম্যানতো ঘোষণাই করেছেন যে পৌরাণিক ইতিহাস, যা আমার ধারণা রামায়ণ ও মহাভারতের সংমিশ্রণ, রচনা করাই আজকের ঐতিহাসিকদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

ঔরঙ্গজেব রোডের নতুন নামকরণ এবং আরএসএস প্রভাবিত সংগঠনগুলির '১০০০ বছরের বিদেশী শাসন বিরোধী উচ্চকিত জেহাদ দেখেই বোঝা যাচ্ছে দিল্লির সুলতানি আমল এবং মুঘল সাম্রাজ্যকে নিয়ে একইরকম কাঁটাছেড়া করা হবে, যা করা হয়েছিল প্রথম এন ডি এ সরকারের আমলে 'ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডুকেশনাল রিসার্চ

মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব

এণ্ড ট্রেনিং'-এর ইতিহাসের পাঠ্য বইগুলিতে। বর্তমান সময়ে বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য ইতিহাসের যে পাঠ্য পুস্তকগুলির আত্মপ্রকাশ ঘটতে চলেছে, সেগুলি রহস্য ও কুসংস্কারের আকর হিসেবে পূর্বসূরিদেরও ছাপিয়ে যাবে।

স্বভাবতই ইতিহাসকে রহস্য-রোমাঞ্চের স্তরে নামিয়ে আনার আর এস এস-এর পরিকল্পনার সাথে প্রকৃত শিক্ষার বিষয় হিসেবে ইতিহাসকে নিয়ে বিতর্ক করা অর্থহীন। এই ধরনের কোন তাত্ত্বিক বিতর্ক করার কার্যত কোন সুযোগই নেই। তবে আশার দিক হল ইতিহাসকে ভ্রান্তভাবে উপস্থাপনা করলেই প্রকৃত ইতিহাসকে পাল্টে দেওয়া যায় না। কিন্তু জাতির মানসিক গঠনের বড়রকমের ক্ষতি হতে পারে।

প্র ঃ আর্যদের উৎস সম্পর্কে ইতিহাসবিদগণ কিভাবে বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছেন? হিন্দুত্ববাদীরা বরাবরই বলছেন যে আর্যরা ভারতেরই অধিবাসী। এর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে কি? ইতিহাসে আর্যদের সম্পর্কে সাধারণভাবে গৃহীত অভিমত কি?

ইরফান হাবিব ঃ এটা ঠিকই যে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করার মধ্য দিয়ে আর্যদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা গেছে। ইন্দো-ইরানীয় ভাষায় 'আর্য' কথাটির অর্থ হল 'মহান'। 'ইরান' শব্দটি নিজেই 'আর্য' শব্দের ভৌগোলিক বহুবচন। কিন্তু ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাভাষী সকলকেই 'আর্য' হিসেবে চিহ্নিত করা নাৎসিদের কারসাজি। নাৎসিরাই দাবি করেছিল জার্মানরা হল পবিত্রতম আর্য। এটা পরিষ্কার 'ইন্দো-ইউরোপীয়' ভাষার সাথে জাতি বা ধর্মের কোন কোন যোগাযোগ নেই। 'ইন্দো-ইউরোপীয়' বলতে বোঝায় সমধর্মী ভাষায় কথা বলেন এমন জনগোষ্ঠী। দ্বিতীয়ত, ভাষাতত্ত্বের চর্চার মধ্য দিয়ে 'প্রোটো-ইন্দো-ইউরোপীয়' পূর্বপুরুষের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে এমন ভাষাগুলির একটি পর্যায়ক্রমিক সারণী প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য ভাষার অবস্থান অনেকটাই দূরবর্তী। পর্যায় সারণীতে ঋগবেদের ভাষা

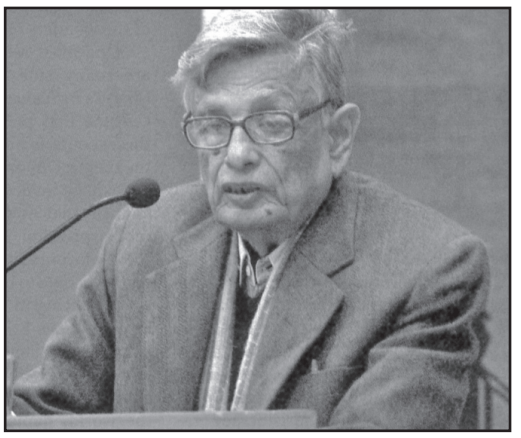

অধ্যাপক ইরফান হাবিব

সংস্কৃত এবং আবেস্তানের অবস্থান—যা থেকে 'প্রোটো-আর্য' বা 'প্রোটো-ইন্দো-ইরানীয়' ভাষার পুনর্নির্মাণ সম্ভব, 'হিট্টাইটি' বা 'আলবেনিয়ান'-এর তুলনায় অনেকটাই নীচের দিকে। সুতরাং এটা একরকম অসম্ভবই যে ভারতবর্ষ কোনদিন প্রকৃত প্রোটো-ইন্দো-ইউরোপীয়' ভাষার আদিভূমি ছিল। তাই, কোন প্রমাণ ছাড়াই, ছেলে মানুষের মত এটা দাবি করার, যেমন নাৎসিরা করেছিল, কোন মানেই হয় না যে আমরা 'আর্যরাই' একদিন সারা পৃথিবী ঘুরে সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়েছি। যেন মনে হয় 'আর্য' বা 'ইন্দো-ইউরোপীয়' আর 'সভ্যতা' সমার্থক। প্রকৃত প্রস্তাবে 'প্রোটো-ইন্দো-ইউরোপীয়' ভাষার আভিধানিক পুনর্গঠন সমাজের একটি অত্যন্ত প্রাচীন স্তরের প্রতি দিকনির্দেশ করে।

প্র ঃ সম্প্রতি সরকার দিল্লীর ঔরঙ্গজেব রোডের নাম পরিবর্তন করে এ পি জে আব্দুল কালাম রোড রেখেছে। এই তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে 'হিন্দু-বিদ্বেষী' নামে সুপরিচিত একজন মুঘল সম্রাটের স্মৃতি মুছে ফেলা হল। আপনি কিভাবে ঔরঙ্গজেব ও তাঁর সময়কে মূল্যায়ণ করবেন? কিভাবেই বা সঙ্ঘ পরিবার ঔরঙ্গজেবের হিন্দু-বিদ্বেষী ভাবমূর্তিকে জনমানসে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারল এবং এই বিষয়ে পেশাদার ইতিহাসবিদ্‌দের অভিমত কি?

ইরফান হাবিব ঃ ঔরঙ্গজেব রোডের নাম পরিবর্তনকে যেমন সমর্থন করা যায় না, তেমনই তাঁর পক্ষে ওকালতি করারও কোন কারণ নেই। তিনি তাঁর দুই ভাইকে হত্যা করেছিলেন, বাবাকে বন্দী করেছিলেন, তাঁর পূর্বসূরিদের ধর্ম-নীতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, অ-মুসলিমদের ওপর জিজিয়ার মতন বৈষম্যমূলক কর চাপিয়েছিলেন এবং মথুরার কেশবরাই মন্দির সহ আরো বেশকিছু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। আবার পাশাপাশি বৃন্দাবনের মন্দিরগুলি সহ বিভিন্ন মন্দিরে অনুদান বা বিভিন্ন ধরনের ছাড় দেওয়ার যে আদেশ দিয়েছিলেন তাও জানা যায়।

তাঁর সময়ে যে সমস্ত বিদেশী পর্যটকেরা এসেছিলেন, তাঁরা কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতায় সহনশীল প্রশাসনকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। উভয় ধরনের মৌলবাদীরাই তাঁর ভ্রান্ত ছবি এঁকেছে। একপক্ষ বলেছে তিনি ছিলেন ধর্মগুরু এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আর একপক্ষ বলেছে তিনি ছিলেন ধর্মীয় উগ্রবাদী। কোনটিই ঠিক নয়। তাঁর একটা বড় কৃতিত্ব হল, তিনি কিছুদিনের জন্য হলেও সমগ্র ভারতকে একটি রাজনৈতিক কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন এবং তাঁর সময়েই মুঘল সাম্রাজ্য ও 'হিন্দুস্তান'-এর পরিচিতি সমার্থক হয়ে পড়েছিল। বিস্ময়কর হল 'হিন্দুস্তান' পরবর্তীকালে একটি জনপ্রিয় গণচেতনায় পরিণত হয়েছিল, যেমন ১৮৫৭ সালে যে সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিলেন তাঁদের কাছে। যদিও সিপাহীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ।

প্র ঃ ঔরঙ্গজেব সাধারণভাবে হিন্দু মন্দির ধ্বংসকারী হিসাবেই পরিচিত। যেমন বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দির এবং মথুরার কৃষ্ণ জন্মভূমি। সঙঘ পরিবার মুসলিম/ বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য সোমনাথ মন্দিরের উদাহরণকেও হাজির করে। ঐতিহাসিক রিচার্ড ঈটন মন্দির ধ্বংসের রহস্য উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন। এই বিষয়ে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের অভিমত কি?

ইরফান হাবিব ঃ ঔরঙ্গজেব রোডের নাম পরিবর্তন মনে হয় প্রথম ধাপ। আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের হাত ধরেই গণতন্ত্রের ধারণা জনচেতনায় স্থান পেয়েছিল। দিল্লীর সুলতানী আমল এবং মুঘল সাম্রাজ্য উভয়ই ছিল অভিজাতবর্গের শাসন। যেখানে অভিজাতবর্গ ছিলেন প্রধানত মুসলিম এবং সামন্তপ্রভু বা জমিদারেরা ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু। এমনটা দেখা গেছে, ঔরঙ্গজেবের শাসনের শেষপর্বে, তাঁর

গজনীর মাহমুদ

সেনাপ্রধানদের তিরিশ শতাংশই ছিলেন হিন্দু এবং মূলত রাজপুত ও মারাঠা। অধিকন্তু এই শাসকেরা কখনই আমাদের দেশকে রিক্ত করে বিদেশে সম্পদ পাচার করা বিদেশী ছিলেন না। সুতরাং মুসলিম শাসনকালকে বৈদেশিক শাসন হিসেবে চিহ্নিত করা অবাস্তব। তাঁরা যা তৈরি করেছিলেন এবং রেখে গেছেন, সৌধ বা শিল্পে, তা ভারতের গৌরব ও সুনাম বৃদ্ধি করেছে।

মন্দির ধ্বংসের বিষয়ে আমি রিচার্ড ঈটনের সাথে সম্পূর্ণ একমত নই। যদিও তিনি এগুলির নিন্দা করেননি। অপরদিকে আমাদের মনে রাখা দরকার সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেছিলেন গজনীর মামুদ, যাঁকে মুসলিম শাসক হিসেবে গণ্য করা হয় না। ঘটনাচক্রে ঔরঙ্গজেবের মতই মামুদও ছিলেন একজন জটিল চরিত্রের শাসক। তাঁরও হিন্দু সেনাপ্রধানের নেতৃত্বাধীন বিশাল হিন্দু সেনাবাহিনী ছিল। যাঁদের তিনি ব্যবহার করতেন মুসলমান শাসনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। তাঁর প্রিয় সেনাপ্রধান ছিলেন তিলক, একজন অসম সাহসী তান্ত্রিক। দিল্লীর সুলতানী আমলে বহু মন্দির নির্মিত হয়েছে, যার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দিরের পুনর্নির্মাণ (১২৯৫-৯৮)। মুঘল আমলে যত মন্দির নির্মিত বা পুনর্গঠিত হয়েছে, তার তালিকা বিশাল। আমি যখন ঔরঙ্গজেবের শেষ জীবনে লেখা কিছু ব্যক্তিগত চিঠি পড়ছিলাম, তখন তাঁর এক ছেলেকে লেখা একটি চিঠি আমাকে চমকে দিয়েছে। যেখানে তিনি ছেলেকে বলছেন, ঔরঙ্গাবাদ যাওয়ার সময় ইলোরার ভাস্কর্য দেখতে ভুলো না। এগুলি ভগবানের অন্যতম বিস্ময়কর সৃষ্টি।

মনে রাখা দরকার সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক রয়েছে। ১৯২৮ সাল বা ঐ সময়ে প্রকাশিত তারাচাঁদের গ্রন্থ 'ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব' এই বিষয়ের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। একটি বিষয়ই ওখানে অনুপস্থিত এবং তা হল সুনির্দিষ্ট দেশপ্রেমের আবেদন, যার এখন পুনঃপ্রকাশ ঘটছে।

প্রথম প্রকৃত দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ, ভারতবর্ষ তার জনগণকে অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করা, এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জলবায়ু, ব্রাহ্মণদের পাণ্ডিত্য, বিভিন্ন ভাষার উৎকর্ষতা, বিশেষত সংস্কৃত ভাষার, বিশ্বের দরবারে ভারতীয়দের উল্লেখযোগ্য অবদান, যেমন সংখ্যায় দশমিকের প্রয়োগ (হিন্ডসা), দাবা খেলা ও পঞ্চতন্ত্রের গল্প— এর কোনটিই কিন্তু কোন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম উল্লেখিত হয়নি, উল্লেখিত হয়েছে, ১৩১৮ খ্রিস্টাব্দে সভাকবি আমীর খসরুর পার্সি ভাষায় লেখা 'নুহখ সিপিহর' গ্রন্থে। বৈদেশিক শাসনের কেমন অদ্ভুত সৃষ্টি! তাই না?

তাঁরাচাঁদ নিজেই লক্ষ্য করেছিলেন দিল্লীর সুলতানি আমলে ভারতীয়দের মধ্যে এক বৃহত্তর ঐক্যের ধারণা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এরও বাইরে গড়ে উঠেছিল, অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলেও, অন্যান্য দেশের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিপুল জ্ঞান, যা নিশ্চিতভাবে পারসিক-আরবীয় প্রভাবের ফল।

প্রঃ সঙঘ পরিবারের বক্তব্য হল মুঘল ও দিল্লীর সুলতানি আমল ছিল হিন্দু বিরোধী এবং ওই সময়গুলিতে মুসলিম শাসকেরা হিন্দুদের উদ্বৃত্ত সম্পদ লুট করেছে। আপনার মত কী?

ইরফান হাবিব ঃ আমার মনে হয় প্রশ্নের প্রথম অংশের সম্পর্কে আমি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বলেছি। দ্বিতীয়ত অংশের সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল, হিন্দুরা উদ্বৃত্ত তৈরী করত আর মুসলিমরা তা লুট করত, এই প্রচার সম্পূর্ণ অবাস্তব ও মিথ্যা। আমরা যদি মুঘল আমলে জমিদার বর্গের অঞ্চলভিত্তিক আয় বোঝার জন্য ওই সময়ের একটি সমীক্ষা যা আইন-ই-আকবরী (সিরকা ১৫৯৫) আমরা দেখি, তাহলে দেখব অধিকাংশ হিন্দু জমিদারেরা ছিলেন উচ্চবর্ণীয় হিন্দু। এমনকি বাংলার মত রাজ্য যেখানে অধিকাংশ কৃষকই ছিলেন মুসলিম, সেখানেও জমিদারেরাও ছিলেন মূলত হিন্দু কায়স্থ। ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত এই চিত্রে কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

ভারতবর্ষের দারিদ্র্য নিয়ে যত বিদেশী লেখা আমরা দেখতে পাই তাতে কোথাও মুসলমানরা বাদ যায়নি। ভূমি রাজস্ব প্রদানের ক্ষেত্রেও মুসলিম প্রজারা কোন বিশেষ সুবিধা পেতেন না। মজুরির ক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলিম শ্রমজীবীদের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। মুসলিমদের ক্ষেত্রে একমাত্র যাদের হাতে কিছু সম্পদ ছিল তারা ছিলেন বেনিয়া সম্প্রদায়, যারা মুঘল আমলে ব্যাঙ্ক ও বিমা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতেন। সুতরাং সঙঘ পরিবারের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। □

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ ফ্রন্টলাইন পত্রিকার অক্টোবর ১৬, ২০১৫ সংখ্যায় প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিবের এই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন অজয় আশীর্বাদ মহাপ্রশস্থ। বর্তমান সময়ে এর অপরিসীম প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে, অনুবাদ আকারে প্রকাশ করা হল। এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল প্রথম অংশ। শেষ অংশ নভেম্বর সংখ্যায়। অনুবাদ করেছে সুমিত ভট্টাচার্য)

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

স্কীম চালু করার চেষ্টা করে। এর বিরুদ্ধে ১.৪.২০১৩ একদিনের ধর্মঘট এবং জানুয়ারি ২০১৪ থেকে আমরা লাগাতার ধর্মঘটে যাই। সরকার এর ফলে কিছুটা পিছু হটেছে। সমুদয় অর্থ (কর্মচারীদের দেয় + সরকারের দেয় সমপরিমাণ অর্থ) অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কে জমা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকার যে পি এফ আর ডি এ কার্যকরী করেছে তা আদৌ কোনো পেনশন ব্যবস্থাই নয়। কর্মচারীদের নামে যে অর্থ জমা পড়বে, তার ৪০ শতাংশ শেয়ার মার্কেটে খাটবে। শেয়ার মার্কেট মানে চরম অনিশ্চিত বিষয়। ২০০৮ সালে বিশ্ব আর্থিক সঙ্কটের সময়ে ক্যালিফোর্নিয়ার কর্মচারীদের পেনশন জলে চলে যায়। আমাদের দেশে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা ছাড়া সর্বত্র পি এফ আর ডি এ চালু হয়েছে।

প্র ঃ কেরালায় শিক্ষক-কর্মচারী সংগঠনগুলির সাংগঠনিক শক্তি কেমন?

শ্রী কুমার ঃ কেরালার কোনো ক্যাডার বা দপ্তর ভিত্তিক সংগঠন নেই। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একটিই সংগঠন। যেগুলির সাংগঠনিক কাঠামো এককেন্দ্রীক বা ইউনিটরি। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সংগঠন (কেরালা এন জি ও), শিক্ষকদের সংগঠন, কলেজ শিক্ষকদের সংগঠন, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কসদের সংগঠন প্রভৃতি। এইভাবে ৯টি সংগঠনের যৌথমঞ্চে এফ ই সি টি ইউ। সরকারী কর্মচারী সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৮৬০০০ (নন-গেজেটেড), গেজেটেড অফিসারদের সংগঠন ৫০০০, শিক্ষক ২০,০০০, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কার্স ৫০,০০০ প্রভৃতি।

প্র ঃ ২ সেপ্টেম্বর সর্বভারতীয় ধর্মঘটে রাজ্য কর্মচারীদের অংশগ্রহণ কেমন ছিল?

শ্রী কুমার ঃ এবারের ধর্মঘট সমস্ত দিক থেকেই বিপুল সাফল্য লাভ করেছে। অতীতের ১৫টি ধর্মঘটকে ছাপিয়ে গেছে ষোড়শ ধর্মঘটের ফলাফল। রাজ্য কর্মচারীরাও অতীতের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় এই ধর্মঘটে অংশ নিয়েছেন। প্রায় সব রাজ্যেই ধর্মঘট হয়েছে। হিন্দী ভাষী রাজ্যেও এবার ধর্মঘটের চিত্র ভালো। কেরালার ৯০ শতাং কর্মচারী শিক্ষক ধর্মঘট করেছেন। জম্মু ও কাশ্মীরে ৪০ শতাংশ, হিমাচল প্রদেশে ৪০ শতাংশ, পাঞ্জাবে ৬০ শতাংশ, হরিয়ানায় ৯০ শতাংশ, রাজস্থানে ৫০ শতাংশ, তামিলনাড়ুতে ৫০ শতাংশ, কর্নাটকে ৩৫-৪০ শতাংশ, ঝাড়খন্ড ও বিহারে ৫০ শতাংশ। মহারাষ্ট্রেও ধর্মঘট ভালো হয়েছে এমনকি গুজরাটে আমাদের তেমন কোনো সংগঠন না থাকলেও ধর্মঘট হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় ঐদিন কর্মচারীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গেও এত প্রশাসনিক আক্রমণের মধ্যেও ৩৫-৪০ শতাংশ কর্মচারী ধর্মঘট করেছেন। এই প্রসঙ্গে যেটা মনে রাখা দরকার তা হল, সর্বত্রই স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা কমছে। বিগত দু-দশকের কিছু বেশি সময়ে এই সংখ্যা ৮০ লক্ষ থেকে নেমে ৬০ লক্ষ হয়েছে। এইভাবে চললে ২০ বছর পর স্থায়ী কর্মচারী প্রশাসনে আর থাকবে না। আমাদের লড়াই চলছে। সম্প্রতি ১০ বছর চুক্তিতে কাজ করার পর হিমাচল প্রদেশে ১৩২৫ জন কর্মচারীকে স্থায়ী করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরগুলির অবস্থাও তাই। ৬০ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে। সরকারের লক্ষ্য হল অল্প কিছু কর্মচারীকে বেশি মাইনে দিয়ে কর্পোরেট কায়দায় প্রশাসন পরিচালনা। রাজ্য সরকারগুলিও একই পথে চলছে। একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে প্রশাসনে কর্মচারী সংখ্যা কমছে।

প্র ঃ পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঘট ভাঙার জন্য রাজ্য সরকার যে সার্কুলার জারি করেছিল, অন্য কোনো রাজ্যে তেমন কোনো ঘটনা ঘটেছে কি?

শ্রী কুমার ঃ না, নেতিবাচক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ ব্যতিক্রম। না ধর্মঘট ভাঙার জন্য এমন আক্রমণ আর কোন সরকার নামিয়ে আনেনি।

প্র ঃ ধর্মঘট পরবর্তী পরিস্থিতিতে সর্বভারতীয় কোনো কর্মসূচীর কথা ভাবা হচ্ছে কী?

শ্রী কুমার ঃ নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মণিপুরে আমাদের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। ঐ সভায় আমরা সাংগঠনিক বিষয়ে পর্যালোচনা করে আগামী কর্মসূচীর রূপরেখা তৈরি করবো। কর্মী সংগঠকদের জন্য শিক্ষামূলক ওয়ার্কশপের কথাও আমরা ভাবছি।

প্র ঃ পশ্চিমবঙ্গে কর্মচারীদের কাছে আপনার বার্তা কী?

শ্রী কুমার ঃ পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারীদের লড়াকু ঐতিহ্য রয়েছে। সাতের দশকে আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের মোকাবিলা করে বহু অত্যাচার সহ্য করেও পরিস্থিতিকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছি। এবারেও পারবেন। বর্তমান দমবন্ধ করা পরিস্থিতিকে অতিক্রম করার সাহস ও ধৈর্য পশ্চিমবাংলার কর্মচারীদের রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি জয় তাঁদের হবেই।

এরপরে সর্বভারতীয় সংগঠনের সহ-সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুল-- দাসকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়।

প্র ঃ বিহারের কর্মচারী আন্দোলন সম্পর্কে কিছু বলুন।

মঞ্জুল দাস ঃ বিহারে পশ্চিমবঙ্গ বা কেরালার মতো সমাজ সংস্কার আন্দোলন হয়নি। ফলে বিহারে গণ আন্দোলন অপেক্ষাকৃত দুর্বল। ১৯৬৮ সালে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা প্রথম ধর্মঘট করে, ১৯৯৬ সাল থেকে আমরা কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পেতে শুরু করি। অতীতে আমরা বহু ধর্মঘট করেছি। এমনকি ১১৬ দিন টানা ধর্মঘট হয়েছে। বর্তমান নীতিশ কুমারের সরকার সব ধর্মঘটের টাকা ফেরৎ দিয়েছে। মহার্ঘভাতায় আমরা ১ শতাংশও পিছিয়ে নেই। ১০-২০-৩০ বছরের ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট চালু হয়েছে। ওয়ার্ক চার্জড কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ হয়েছে। ১,৫০,০০০ শিক্ষককে রেগুলার পে-স্কেলে আনা গেছে। ২ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘট পাটনা বাদে সর্বত্র ভাল হয়েছে।

প্র ঃ পশ্চিমবাংলার কর্মচারীদের জন্য আপনার বার্তা কি?

মঞ্জুল দাস ঃ পশ্চিমবাংলায় এখন মূল প্রশ্ন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াই। গণতন্ত্রকে রক্ষা করা না গেলে আর সব আন্দোলনই দূর্বল হবে। মহার্ঘভাতা, বেতন কমিশনের দাবি আদায়ের জন্য প্রথম প্রয়োজন গণতান্ত্রিক পরিবেশকে রক্ষা করা। স্বৈরাচারী চরিত্রের প্রশাসন কখনও শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবি মানে না। অধিকার কেড়ে নিতে চায়। তাই পশ্চিমবাংলায় গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য যে লড়াই শুরু হয়েছে, কর্মচারীদেরও সেই লড়াই-এ সামিল হতে হবে। আমি নিশ্চিত পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী কর্মচারীরা নিষ্ঠার সাথে এই দায়িত্ব পালন করবেন। □

দলিত খুনে ক্ষোভ দেশজুড়ে

দেশের রাজধানী দিল্লী থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে হরিয়ানার শোনপেড়ে দু'বছরের শিশুপুত্র বৈভব এবং দশমাসের শিশুকন্যা দিব্যাকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে গত ১৯ অক্টোবর। এই দুই শিশুর অপরাধ ছিল তারা দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত, তাই তথাকথিত উচ্চবর্ণের বলে দাবি করা কিছু মানুষ তাদের এই শাস্তি দিয়েছে। হরিয়ানায় দলিতদের ওপর আক্রমণ প্রায়ই ঘটছে। সরকারী তথ্য অনুযায়ী গত ১৫ বছরের মধ্যে নিচুজাতের ওপর অপরাধের ঘটনা সাতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গোটা পরিবারটিকে হত্যা করার জন্য বাড়িতে পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই শিশুদের বাবা আক্রান্ত হলেও রক্ষা পেয়েছেন, দগ্ধ মা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর গোটা দেশের মানুষ তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। রাজনৈতিক মহলেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এই নৃশংস ঘটনা। বিদেশ প্রতিমন্ত্রী ভি কে সিংয়ের দলিত শিশু হত্যার পরবর্তীতে করা মন্তব্য (''কেউ কুকুরকে ঢিল ছুঁড়লে সেটাও কি সরকারের দায়?'') গোটা ঘটনায় ঘৃতাহুতি দিয়েছে। দলিত শিশু হত্যার ঘটনার তিনদিন না কাটতেই হরিয়ানারই সোনেপত জেলার গোহানার দেবীপুরার শিব কলোনির একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে গোবিন্দ নামে বছর পনেরোর এক দলিত কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। চারটি পায়রা, দুটি মোবাইল ফোন এবং হাজার পাঁচেক টাকা চুরির অভিযোগের প্রেক্ষিতে যে দলিত কিশোরকে আটক করে গোহানা থানার পুলিশ। পরের দিন সকালেই গোবিন্দর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। দুই পুলিশকর্মী ছেলেকে পিটিয়ে খুন করে বাড়ির কাছে ফেলে দিয়ে গেছে বলে অভিযোগ দায়ের করেছেন ছেলেটির মা। যদিও অভিযোগ উড়িয়ে পুলিশ জানিয়েছে পালিয়ে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে গোবিন্দ, তার গলায় ফাঁসের দাগ রয়েছে। এছাড়াও সারা শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন মিলেছে।

স্বাধীনতার পর তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের ওপরে অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনেক আইন হয়েছে। কিন্তু বেড়েই চলেছে এই অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা। যখনই তফসিলি জাতি ও আদিবাসীরা তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তখনই তাঁদের ওপরে নেমে আসে অত্যাচার ও নৃশংসতা। সুপ্রিম কোর্টও বলেছে তফসিলি জাতি-উপজাতিদের ওপরে সংগঠিত অপরাধকে সাধারণ ফৌজদারি বিধিতে নয়, আরও কঠোরভাবে এর বিচার হওয়া উচিত। ২০১০ সালে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লোকসভায় বলেছিলেন যে ২০০৬ সালে এই অপরাধের ঘটনা ছিলো (অসংখ্য কেস রেকর্ড না হওয়া সত্ত্বেও) ২৬,৬৬৫। ২০০৮ সালে ৩৩,৩৬০। কিন্তু শাস্তি হয়েছে মাত্র ৩০ শতাংশ ক্ষেত্রে আর ৮০ শতাংশ মামলাই ঠান্ডা ঘরে। □

আক্রান্ত বহুত্ববাদ, আক্রান্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা

(অষ্টম পৃষ্ঠার পর)

বিজেপি-র কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও চুপ। ভাবখানা এমন যেন কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু প্রতিবাদীদের কণ্ঠরোধ করার ক্ষমতা কোন শক্তির নেই। সেই শক্তি যত ফ্যাসিস্ট মনোভাবাপন্নই হোক না কেন। তাই সারাভারত জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। অভূতপূর্ব ও নজিরবিহীনভাবে মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। উষ্মা প্রকাশ করে তাঁর বক্তব্য— রাজনৈতিক বিষয়ে আমি মত দিই না। কিন্তু বহুত্ববাদ আক্রান্ত হলে ভারতীয় সভ্যতাই বিপন্ন হবে।

প্রতিবাদের ঢেউ তুলেছেন দেশজুড়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ, চলচ্চিত্র জগত ও সংস্কৃতি জগতের প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ নানা ধরনের সরকারী পুরস্কার ফিরিয়ে দিয়ে অভিনব প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন। সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার ফিরিয়েছেন হিন্দী কবি মঙ্গলেশ দাবরাল, রাজেশ যোশী, বিশিষ্ট লেখক আমন শোঠি, উদয় প্রকাশ, নয়নতারা সেহগাল, অশোক বাজপেয়ী, সারা যোসেফ, রহমান আব্বাস, গুরুচরণ সিং ভুল্লার, মন্দাক্রান্তা সেন, নন্দ ভরদ্বাজ। সাহিত্য আকাদেমি থেকে পদত্যাগ করেছেন কে সচিদানন্দন। সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার ফিরিয়েছেন নাট্য পরিচালক মায়া কৃষ্ণা রাও। জাতীয় পুরস্কার ফিরিয়েছেন দশজন চিত্র পরিচালক। এঁদের মধ্যে রয়েছেন বিশিষ্ট তথ্যচিত্র নির্মাতা আনন্দ পটবর্ধন, ফিচার ফিল্ম পরিচালক দিবাকর

মহম্মদ আখলাখ

ব্যানার্জী, নিষ্ঠা জৈন প্রমুখ।

প্রতিবাদে 'পদ্মশ্রী' ফিরিয়েছেন বিশিষ্ট পাঞ্জাবী লেখিকা দলিপ কউর ভিওয়ানা, 'পদ্মভূষণ' পুরস্কার ফিরিয়ে দিয়েছেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী পুষ্প মিত্র ভার্গব। প্রতিবাদ করেছেন বিখ্যাত সরোদ বাদক আমজাদ আলি খান এবং বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শাহরুখ খান।

পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা দেশে ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি পাঠিয়েছেন। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন নবনীতা দেবসেন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অশোক মিত্র, শঙ্খ ঘোষ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অমিয় বাগচী, পবিত্র সরকার, সমরেশ মজুমদার, ওয়াসিম কাপুর, বাণী বসু প্রমুখ।

প্রতিবাদে যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন ৫৩ জন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ। যাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য রোমিলা থাপার, ইরফান হাবিব, অমর ফারুকি, কে এন পানক্কর, বিনয়ভূষণ চৌধুরী, কুমকুম রায় প্রমুখ।

দেশজোড়া এই তীব্র প্রতিবাদকে আমল না দিয়ে প্রতিবাদীদের কট্টর বিজেপি বিরোধী বলে আখ্যা দিয়েছেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী অরুণ জেটলি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর মৌনব্রত বহাল রেখেছেন। □

মানস কুমার বড়ুয়া

উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

কোন ভারতীয় জম্মু ও কাশ্মীরে জমি কিনতে পারে না একইভাবে বাইরের লোকেরা হিমাচল প্রদেশেও জমি কিনতে পারে না। ৩৭০ নং ধারা যদি সংখ্যালঘু তোষণ হয় অপরগুলি কেন সংখ্যাগুরু তোষণ হিসাবে গণ্য হবে না? কেন্দ্র কর্তৃক আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিকে মুসলিম তোষণ নীতির অঙ্গ হিসাবে প্রচার করা হলেও জেনে রাখা ভাল বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ও অনুরূপ সুবিধা ভোগ করে থাকে। সংবিধানের ২৯(২) ধারা মতে এবং আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত আইন অনুযায়ী এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়েই ভর্তি ও নিয়োগের ক্ষেত্রে ধর্ম কোনো বাধা নয়। প্রতিটি নাগরিকের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা সরকারের প্রাথমিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সরকারী পরিসংখ্যান থেকেই জানা যায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জীবন ও সম্পত্তি হানির দিক থেকে মুসলমানরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। পরিসংখ্যান এটাও বলে যে শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানরা পিছিয়ে আছে। দারিদ্র্য এবং বেকারী যে শিক্ষাগত পাশ্চাদ্‌পদতার জন্য মূলত দায়ী একথা কেউ মানতে চায় না। বরং এক্ষেত্রে ধর্ম ও সংস্কৃতিকে দায়ী করে রাষ্ট্রের ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণের চরম শৈথিল্যকে আড়াল করে। অবশ্য এক্ষেত্রে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের উল্লসিত হওয়ার কোন কারণ নেই। মুসলিম সমাজের স্ব-নিযুক্ত মুখপাত্ররা যখন শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর তাঁদের ''বিশ্বাস''কে স্থান দিতে চান, তখনই তারা কিন্তু এইসব ''হিন্দুত্ব''বাদী নেতাদের পথ পরিষ্কার করে দেন। কারণ এই উভয় পক্ষের সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা চায় আদালতের যে কোন নির্দেশের ঊর্ধ্বে তাঁদের ''ধর্ম''কে প্রতিষ্ঠা করতে। কাজেই শুধুমাত্র একধরনের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধাচরণ করলে চলবে না, লড়াই চালাতে হবে সব ধরনের সব বর্ণের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে।

যে সংবিধানের উপর ভিত্তি করে সরকার দেশ চালায় তাকেও মান্যতা দিচ্ছে না বর্তমান কেন্দ্রের আরএসএস পরিচালিত নরেন্দ্র মোদির সরকার। ২০১৫ সালের ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসের বিজ্ঞাপনে সরকার সংবিধানের প্রস্তাবনা ছেপে দেয়, কিন্তু তা থেকে কৌশলে ''সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ'' শব্দ দুটি বাদ দেয়। যদিও ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি এই দুটি শব্দ প্রস্তাবনায় ছিল না। ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংশোধনীতে এই দুটি শব্দ যুক্ত হয়, এবং এখনও পর্যন্ত ৯৮টি সংশোধনী যুক্ত হওয়া সংবিধানই প্রকৃত সংবিধান। কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তি তাঁরা প্রথম প্রস্তাবনাটি ছেপেছেন, তাহলে বাকী সংশোধনীগুলির ভবিষ্যত কি তা সহজেই অনুমেয়। কথা হচ্ছে সরকার কি ইচ্ছে করলেই সংবিধানকে পরিবর্তন করতে পারেন? না পারেন না। ১৯৭৩-এ কেশবানন্দ ভারতী মামলায় সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার জানিয়ে দেয় সংবিধানের মূল কাঠামোকে পরিবর্তন করা যাবে না। ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে কোন দর কষাকষি চলে না। প্রস্তাবনা থেকে শব্দ দুটিকে সরানো আর দেশদ্রোহিতা এক জিনিস। বিশ্বের বৃহত্তম লিখিত সংবিধানে সাধারণ মানুষের চিন্তার প্রতিফলন আছে, এই বোধকে রক্ষা করার শপথ গ্রহণ করতে হবে। হিন্দুত্ববাদের নামে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র পাল্টে দিতে চাইছে এই সরকার। দেশের বিভিন্ন স্থানে ৭০০-এর বেশি দাঙ্গা হয়েছে। এতে মদত দিচ্ছে আরএসএস। এই হিন্দুত্ববাদী দুষ্কৃতীদের শিকার শুধু মুসলমানরা নয়, খ্রিস্টানরাও আক্রান্ত হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও ওড়িশায় খ্রিস্টানরা আক্রমণের শিকার। খোদ দিল্লীতে গির্জা পুড়েছে। সংঘ পরিবার জোর করে ধর্মান্তরকরণ করছে। অভিযোগের তীর সংঘ পরিবারের অন্যতম সদস্য বজরং দলের দিকে। অতি সম্প্রতি বাড়িতে গোমাংস রাখার অভিযোগে মহম্মদ আখলাকের গণপিটুনিতে হত্যা নিঃসন্দেহে অন্যতম নৃশংস ঘটনা। একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশে স্বাধীন ধর্মাচার পালনের প্রশ্নের আগে আসে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি। প্রধানমন্ত্রীর মুখে কুলুপ। গো-হত্যা বিষয়ক নীতিভাবনার আগে আইনমাফিক হত্যাকারীদের কঠিন শাস্তির প্রয়োজন। কিন্তু গণতান্ত্রিক ভারত বিশ্বের দরবারে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে বিশেষ আসন দাবি করতে পারলেও নিজের মাটিতে এইটুকু আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম।

ভারত পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতির পক্ষে আদর্শ জায়গা। হাজারটা ভাষা, ধর্ম, জাতি ও সংস্কৃতি এই দেশে আছে। এইসমস্ত হাজারোরকম পরিচয়কে ভিত্তি করে এখানে রমরমিয়ে রাজনীতি চলছে। অণুভিত্তিক এই রাজনীতির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আছে শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতি। শ্রেণীর পরিচয়ের উপর নির্ভর করে শোষিত মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে সমাজতন্ত্র নির্মাণ— বামপন্থীদের লক্ষ্য। একমাত্র বামপন্থীরাই পারেন তাঁদের মতাদর্শগত শক্তিকে সংহত করে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে, পারেন উগ্র হিন্দুত্ববাদের নামে ফ্যাসিবাদের আগ্রাসনকে রুখতে। তথাকথিত সাধু-সন্ত-ইমাম-ফকিরদের অধিকার দেশের সাধারণ নাগরিকের চেয়ে বেশি থাকতে পারে না। সংবিধানের উপর বিশ্বাসের স্থান হতে পারে না। জাতীয় নেতারা যখন দেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন তখনই স্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষ গঠনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। আমাদের সভ্য আধুনিক জীবন প্রবাহকে বিপথগামী করার যে সর্বনাশা প্রচেষ্টা বর্তমানে চলছে। এক সঙ্কল্পবদ্ধ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ— যেমন গণ আন্দোলন ও জন জাগরণের মাধ্যমেই তাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। □

আগুন নিয়ে খেলো না

রাজিন্দার সাচার

(এক)

সম্প্রতি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'বৈদিক সংস্কৃত সম্মেলন' -এর মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের বিভাজনের কৌশল সৃষ্টি করার মরীয়া প্রচেষ্টা পরিস্ফুট হয়। না, সংস্কৃত বিরোধী আমি নই। আমি নিজেই মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে সংস্কৃত নিয়েছিলাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এর পিছনে কারণ ছিল একটাই। সংস্কৃতে ভাল নম্বর তোলা যায়। সংস্কৃত ভাষা সমস্ত ভাষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই ভালবেসে সংস্কৃত নিয়েছিলাম, বুক বাজিয়ে এমন মুর্খের মতন দাবি আমি করব না। প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব বৈশিষ্ট রয়েছে। রয়েছে প্রয়োগের ক্ষেত্র এবং দর্শনও। যে সমস্ত ভাষা দৈনন্দিন জীবনে, প্রশাসনে ও শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, সেগুলির মানোন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে। সংস্কৃত, পারসিক বা আরবিকের মতন ঐতিহ্যবাহী ভাষাগুলি শুধুমাত্র বিশেষ চর্চার ক্ষেত্র হতে পারে। হিন্দি, উর্দু বা রাজ্য ভিত্তিক ভাষাগুলিই প্রকৃতি কার্যকরী বিকল্প।

কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে সংস্কৃত ভাষাকে শ্রেষ্ঠ ভাষা হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলছে। শ্রী দীননাথ বাত্রা, যিনি আর এস এস প্রভাবিত শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন সমিতির আহ্বায়ক (এবং যিনি হরিয়ানার বি জে পি পরিচালিত সরকারের অনুরোধে নীতি বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক লিখছেন) তাঁর বৈষম্যমূলক মন্তব্যে এমন কথা বলারও ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন যে, রামায়ণ ও মহাভারত যেহেতু ইতিহাসের অংশ তাই স্কুলে পাঠ্য হওয়া উচিত। কিন্তু কোরান বা বাইবেলকে যেহেতু তিনি ইতিহাসের অংশ বলে মনে করেন না, তাই স্কুল পাঠ্যে এগুলির অন্তর্ভুক্তির কোন প্রয়োজন নেই। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য এর থেকে বেশী প্ররোচনামূলক মন্তব্য আর কি হতে পারে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং, যিনি ইতিমধ্যেই নেহেরু লাইব্রেরী সম্পর্কে একটি অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন এবং ফন্দি করে ঐ সংস্থার অধিকর্তাকে পদত্যাগে বাধ্য করেছেন, বেশ কয়েকজন বিজেপি-র রথী-মহারথীকে সাথে নিয়ে উল্লসিত ভঙ্গীমায় নেহরু লাইব্রেরীতে প্রবেশ করে ঘোষণা করলেন সমস্ত বিষয়ে বিতর্ক হওয়া উচিত এবং ফলাও করে বিজেপির নেতা দীনদয়াল উপাধ্যায়ের 'অখন্ড মানবতা'-কথা বলে গেলেন। বিতর্কের প্রস্তাবটি ভালই, যদিও উদ্দেশ্যটা বিভেদ সৃষ্টি করা। বিতর্ক যদি করতেই হয় তাহলে সব মতকে শোনা দরকার। দীনদয়াল উপাধ্যায়কে মহান করতে গিয়ে বিজেপি প্রায়শই ডঃ রাম মনোহর লোহিয়ার সাথে উপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা বলে থাকে। যদি তাই হয়, তাহলে অবশ্যই সোশ্যালিস্ট পার্টি (ইন্ডিয়া) -র সভাপতিকে, যিনি জয়প্রকাশ ও লোহিয়ার অনুগামী, এই বিতর্কে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এমনও শোনা যাচ্ছে যে, বৈদিক যুগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আমাদের দেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতির রূপরেখা নির্ধারণের জন্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টরিক্যাল রিসার্চ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চলেছে। এই পরিকল্পনাকে বিশ্বাসযোগ্য করতে হলে অবশ্যই এর সাথে ইরফান হাবিব ও রোমিলা থাপারের মতন দেশের বরিষ্ঠতম দুই ইতিহাসবিদ এবং জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিদ্যার এমিরেটাস অধ্যাপক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ টি কে ওমেনকে অবশ্যই যুক্ত করা উচিত। এটা করলে উক্ত পরিকল্পনাই বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করবে।

(দুই)

বিজেপি নেতৃত্বের উগ্র সাম্প্রদায়িক আচরণ তাদের নীচু তলার কর্মীদের 'গরুর মাংস নিষিদ্ধ' করার দাবি উত্থাপন করে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে উৎসাহিত করছে। খাদ্যভাস নিয়ে প্ররোচনামূলক বক্তব্য প্রচার করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে।

মুসলিম বিরোধী আবহাওয়া তৈরী করা হচ্ছে। সম্প্রতি দাদারির বিসারা গ্রামে যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটল, যেখানে বি জে পি—আর এস এস ভৈরব বাহিনী একটি মুসলিম পরিবারের ওপর বাড়ীতে গরুর মাংস রাখার অভিযোগ নিয়ে চড়াও হয় এবং ঐ পরিবারের একজন সদস্যকে হত্যা করে। এই ঘটনা পরিকল্পিত হত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়—কারণ গণতন্ত্রে রাষ্ট্র মানুষের খাদ্যাভাস ঠিক করে দিতে পারে না।

এটা কি পরিহাসের বিষয় নয়, যে উত্তর প্রদেশ রাজ্যের মধ্যে বাড়ীতে একটুকরো গরুর মাংস রাখার অপরাধে(!) একজন মুসলিমকে হত্যা করা হল, সেই উত্তর প্রদেশ রাজ্যই ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে গরু-মহিষের মাংসের প্রধান রপ্তানিকারক? উত্তর প্রদেশেই রয়েছে সর্বাধিক কসাইখানা-তথা-মাংস প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র। এই রাজ্যে রয়েছে ৩১৭টি নথিবদ্ধ কসাইখানা এবং ২৪টি রপ্তানি কেন্দ্রীক গরু-মহিষের মাংসের কেন্দ্র। গোটা দেশ থেকে যত গরু-মহিষের মাংস বিদেশে রপ্তানি হয়, তার ৬৭ শতাংশ হয় ঐ রাজ্য থেকে।

এই বিষয়ে আইনী অবস্থান সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। ১৯৫৯ সালে সুপ্রীমকোর্ট বলেছে, ''অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা যায়, অকেজো ষাঁড়-বলদ ইত্যাদিকে বাঁচিয়ে রাখার মানেই হল সমাজের ওপর বোঝা এবং এর দ্বারা কোনভাবেই জনস্বার্থ রক্ষিত হয় না। তাই গবাদি পশু হত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা কখনই সম্ভব নয়।''

এক হিসেবে দেখা গেছে, গো-হত্যা নিষিদ্ধ করলে দেশের বার্ষিক মোট অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধির হার প্রায় ২ শতাংশ হ্রাস পাবে।

অর্থনীতিবিদ আবুসালেহ্ শরিফ (যিনি বর্তমানে ওয়াশিংটন ডিসি-তে ভারত-মার্কিন পরিকল্পনা সংস্থায় কর্মরত) দেখিয়েছেন এপ্রিল-নভেম্বর ২০১৪-র মধ্যে গবাদি পশুর মাংস এবং মাংসজাত খাদ্যের বিক্রীর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩.৩ বিলিয়ন ডলার। এক বছর আগে ঐ একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ২.৮ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ একবছরের বৃদ্ধির পরিমাণ ১৬.৭ শতাংশ। এই বৃদ্ধিকে ভারতের সার্বিক বাণিজ্য ঘাটতির প্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। এপ্রিল ২০১৪ থেকে মার্চ ২০১৫ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৩৭ বিলিয়ান ডলার, এবং পূর্বের আর্থিক বছরে এর পরিমাণ ছিল ১৩৪ বিলিয়ান ডলার। আর এসএস - বিজেপির মুসলিম বিরোধী প্রচার কতখানি অন্তঃসার শূণ্য তা বোঝা যায়, যখন দেখা যায় যে গরুর মাংস কেন্দ্রীক ব্যবসার সিংহভাগ লাভই হিন্দুদের ঘরে ঢুকছে। গো-মহিষের মাংসের যে বিপুল রপ্তানি সে সম্পর্কে 'ummid.com'-এর গবেষণা বলছে ''গরুর মাংসের ব্যবসায়ের একটা সামান্য অংশই মুসলিম পায়। গবাদি পশুর মাংসের ব্যবসার থেকে সিংহভাগ লাভই তুলে নেয় অ-মুসলিম সম্প্রদায় এবং সরকার। যার গড় পরিমাণ ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ঐ সংস্থার আরও দেখিয়েছে যে খাদ্য হিসেবে গরুর মাংস গ্রহণের পরিমাণে মুসলিম ও অ-মুসলিমরা প্রায় একই জায়গায় রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন, মাংসের রপ্তানি, হাড়গুঁড়ো করা ও পাউডার শিল্প, চর্মশিল্প, শিং প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, রক্ত প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, প্রাণী চর্বি ও সাবান শিল্প প্রভৃতি, সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্রই অ-মুসলিমরাই নিয়ন্ত্রণ করছেন।

(মূল লেখাটি মেইনস্ট্রীম পত্রিকার অক্টোবর ১৭,২০১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। লেখক রাজিন্দার সাচার দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবং সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানার গঠিত সাচার কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। এখানে অংশ বিশেষের অনুবাদ প্রকাশ করা হল। অনুবাদ করেছেন সুমিত ভট্টাচার্য) □

ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা

ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতি (টিজিইএ) কেন্দ্রীয় মহিলা-সাব কমিটি আয়োজিত এক রাজ্যভিত্তিক আলোচনা সভা বিগত ২৭ সেপ্টেম্বর আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১৪০০ কর্মচারীর (বেশির ভাগই মহিলা) উপস্থিতিতে ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা একটি উদ্বোধনী নৃত্য গীত আলেখ্য পেশ করেন, বিষয়— বিপন্ন স্বদেশ, এসো গড়ি প্রতিরোধ। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতির সভাপতি কমলকৃষ্ণ ভৌমিক। ''ধর্ম-বর্ণ ও সাম্প্রদায়িকতার নামে দেশকে দুর্বল করার চক্রান্ত ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রতিহত করুন''— শীর্ষক আলোচনা সভায় আলোচনা পত্র পেশ করেন টিজিইএ-এর কেন্দ্রীয় মহিলা সাব কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়িকা অঞ্জনা দত্ত। এরপর নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন টিইসিসি (এইচ বি রোড)-এর মহিলা সাব কমিটির আহ্বায়িকা রত্না সরকার, টিজিইএ-এর সাধারণ সম্পাদিকা মহুয়া রায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা দেবলা মুখার্জী এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা সুতপা হাজরা। এরপর ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন টিজিইএ-এর মহিলা সাব কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়িকা শেফালী পাল এবং সর্বশেষে কার্যকরী সভাপতি কমল কৃষ্ণ ভৌমিক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। □

ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান নিয়ে ১ অক্টোবর, ২০১৫ সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গনে হাজারো শিক্ষক-কর্মচারীর সংগ্রামী উপস্থিতিতে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নজরুল কলাক্ষেত্র থেকে স্লোগান মুখরিত বর্ণাঢ্য মিছিল রবীন্দ্র প্রাঙ্গনে পৌঁছালে সমাবেশ স্থল সংগ্রামী স্থলে পরিণত হয়। অফিস ছুটির পরে ভীড়ে ঠাসা কর্মচারীদের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এস শ্রীকুমার, সহ-সাধারণ সম্পাদক শ্রী মঞ্জুল কুমার দাস, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ-সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী এবং টি ই সি সি (এইচ বি রোড)-র সাধারণ সম্পাদক অসীমকুমার পাল। সভাপতি ছিলেন সংগঠনের চেয়ারম্যান সুভাষ চন্দ্র সাহা।

প্রধান বক্তা হিসাবে শ্রীকুমার বলেন, মোদী সরকার সাধারণ মানুষের জন্য ভর্তুকি ছাঁটাই করে ইনসেনটিভ দিচ্ছে কর্পোরেট লবিকে। সরকারী অর্থ ব্যাপকভাবে লুট করা হচ্ছে। আদানি-আম্বানীসহ শিল্পগোষ্ঠীর স্বার্থেই কাজ করছে মোদী সরকার। তারাই স্থির করে দিচ্ছে সরকারী নীতি। বিদেশ সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এফ ডি আই বাড়ানোর স্লোগান দিচ্ছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, বীমা সংস্থাগুলির শেয়ার বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে বিদেশি পুঁজির কাছে। ছেঁটে ফেলা হচ্ছে সামাজিক সুরক্ষা খাতে ভর্তুকি। কৃষিতে সঙ্কট দেখা দিয়েছে। নতুন কর্মসংস্থানের রাস্তা বন্ধ। প্রতিদিন নতুন করে শ্রমিক-কর্মচারী কাজ হারাচ্ছেন। এই অবস্থায় নিজ-নিজ ক্ষেত্রে যখন মানুষ লড়াই করার জন্য তৈরী হচ্ছে তখন ধর্মের নামে, বর্ণের নামে, অঞ্চলের নামে মানুষকে টুকরো টুকরো করার খেলায় মেতেছে বিজেপি সরকার। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে মন্তব্য করেন।

ত্রিপুরার গণতন্ত্রপ্রিয় সংগ্রামী জনগণের পাশাপাশি শিক্ষক-কর্মচারীদের অভিনন্দন জানিয়ে সম্মেলনকে সফল করার আহ্বান জানান সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুল কুমার দাস। তিনি আর এস এস ও বিজেপি'র নেতিবাচক ভূমিকার উল্লেখ করে বলেন, স্কুলে রামায়ণ, মহাভারত, গীতাকে পাঠ্যপুস্তকে আনার চেষ্টা চলছে। মোদী সরকার চলছে আর এস এস-এর নির্দেশে। গান্ধীজীর হত্যাকারীরা এখন মোদীকে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তুলনা করছে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান দমবন্ধ করা আধা ফ্যাসিস্ট জমানায় গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সংগ্রামের উল্লেখ করা হয়। রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও সংগঠনের পতাকাতলে থেকেই প্রশাসনিক আক্রমণকে মোকাবিলা করে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বেতন হয় এমন ৩৫টি সংগঠনকে নিয়ে যৌথ মঞ্চ গঠন করে লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে। ত্রিপুরায় গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইকে শক্তি জোগাতে আহ্বান জানান হয়।

ত্রিপুরায় শান্তি-সম্প্রীতি রক্ষায় দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানান টি ই সি সি-র রাজ্য সম্পাদক অসীম পাল। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের জনমুখী কর্মসূচী রূপায়নের ফলে উপজাতি যুবক-যুবতীরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। শিক্ষার উন্নয়নে রাজ্য যখন এগিয়ে যাচ্ছে, তখন পৃথক 'তুইপ্রাল্যান্ডের' স্লোগান তুলে অরাজকতা তৈরীর চেষ্টা চলছে। এর বিরুদ্ধে সতর্ক বার্তা ছিল সমাবেশে।

উদ্বোধনী অধিবেশন ঃ-

রক্ত পতাকা উত্তোলন ও শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতিনিধি অধিবেশনের সূচনা ঘটে। সংগঠনের সাংস্কৃতিক শাখা শিল্পীদের 'মৌলবাদ দূর হটো ও সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' শীর্ষক অনবদ্য উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা ঘটে।

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রাক্তন সাংসদ ও দ্বাদশ রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির চেয়াম্যান খগেন দাস। সংগঠন সৃষ্টি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে পরিস্থিতি উপযোগী সংগঠন গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনবিরোধী ও দেশ বিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, দেশবাসীর সামনে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকার ক্ষমতায় এসেছিল ১৬ মাসেই মুখোশের আড়ালে মোদীর কুৎসিত ও কদর্য চেহারা উন্মোচিত হয়েছে। নীতির দিক দিয়ে কংগ্রেস ও বিজেপি একই জায়গায় অবস্থান করলেও প্রয়োগের দিক দিয়ে বিজেপি আরও ভয়ঙ্কর। মেক-ইন-ইন্ডিয়া-র স্লোগান তুলে দেশে দেশে ফেরিওয়ালা হয়ে ঘুরছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই প্রথম কোন প্রধানমন্ত্রী এত বেশি বিদেশ সফর করছেন। দেশে জনগণের কোটি কোটি টাকা খরচ করে সংস্কারের পথ আরও উন্মোচিত করে দিচ্ছেন। এর মধ্য দিয়ে ভারতকে আবার পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জিনিসপত্রের দাম কমাবার পরিবর্তে প্রতিদিন হু হু করে বাড়ছে। হিন্দুত্ববাদী আক্রমণকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে আরএসএস-এর লোককে প্রশাসনের অভ্যন্তরে ঢোকানো হচ্ছে। উগ্র হিন্দুত্বের এই আক্রমণ সর্বগ্রাসী। সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে মৌলবাদ মাথাচাড়া দিচ্ছে।

ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার পাশাপাশি সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়েও সারা দেশে বিকল্পের দিশা দেখাচ্ছে। সকলকে গণবণ্টন ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে। 'রেগা'র মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রেও ত্রিপুরা অন্য রাজ্যকে দিশা দেখাচ্ছে। ত্রিপুরা ছোট রাজ্য হয়ে এই কাজ করতে পারলে দেশের সরকার কেন পারছে না? ত্রিপুরার এই উন্নয়ন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মেনে নিতে পারছে না বলেই রাজ্য ভাগের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। তাই, মোদী সরকারের বিরুদ্ধে শিক্ষক-কর্মচারীদের সচেতন হওয়ার পাশাপাশি ধারাবাহিক প্রতিবাদ-আন্দোলনে সোচ্চার হওয়া ও মানুষের ঐক্যকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ সহ ১১টি ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

প্রতিনিধি অধিবেশন—

দ্বাদশ সম্মেলনে সারা রাজ্যের ৩৭টি ক্যাটাগরি, ২২টি বিভাগ এবং ১২টি সংগঠনের পক্ষ থেকে আগত ৭৩৬ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার পাল। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ নন্দন চক্রবর্তী। পশ্চিমবাংলায় তৃণমূলী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সহ মোট ১১টি খসড়া প্রস্তাবাবলী উত্থাপন করা হয়। তাকে সমর্থন জানিয়ে ৪৭ জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। সমগ্র রাজ্যের জনগণকে পরিষেবা প্রদানে নিয়োজিত যে শিক্ষক-কর্মচারী সমাজ তাঁদের বাস্তব সমস্যা, রাজ্যের আর্থিক সীমাবদ্ধতা, সংগঠন পরিচালনার আন্তরিকতা, সংগঠন সম্বন্ধে তাদের আশা-ভরসা-আকাঙ্ক্ষার কথা বিবৃত হয়েছে প্রতিনিধিদের বক্তব্যে যা কর্মী, নেতৃত্বদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের অমূল্য সুযোগকে সার্থক করে তুলেছে। গৃহীত হয়েছে সংগঠনকে বিন্যস্ত করার দৃঢ় অঙ্গীকার। ১ অক্টোবর কলকাতায় বামপন্থী কর্মী নেতৃত্বদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপর পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে পৃথকভাবে ধিক্কার প্রস্তাব গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গের আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষকে গর্জে ওঠার আহ্বান জানান হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্মেলন উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা স্মরণিকা প্রকাশ করেন। তিনি ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের বঞ্চনা ও বর্তমান মোদী সরকারের চতুরতার দ্বারা চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার ফলে রাজ্য সরকারগুলি যে সমস্যার মধ্যে পড়ছে তা তুলে ধরেন। ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্যাটাগরির সুবিধা কেড়ে নেওয়ার উদ্যোগ, যোজনা কমিশন তুলে দেওয়ার বিরোধিতা করে ও পৃথক রাজ্য গঠনের ঘৃণ্য চেষ্টা চলছে তার বিরুদ্ধে সরব হবার আহ্বান জানান। রাজ্যে সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেও জনকল্যাণমুখী কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করতে শিক্ষক-কর্মচারীদের কর্মসংস্কৃতির উপরও বিশেষ আলোকপাত করেন।

বিশেষ অতিথি ত্রিপুরা উপজাতি পরিষদ -এর কার্যনিবাহী সদস্য শ্রী রাধাচরণ দেববর্মা তার মূল্যবান বক্তব্যে মতাদর্শগত চেতনায় নিজেদের শাণিত করে সব অংশের শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

সম্মেলন থেকে ১৯ জন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী ও ৪৮ জন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অসীম কুমার পাল এবং চেয়ারম্যান হিসেবে শ্রী সুভাষ চন্দ্র সাহা পুনরায় নির্বাচিত হন।

বহিঃরঙ্গে ও অন্তর্বস্তুর মেলবন্ধনে প্রকৃত সংগ্রামী চেতনায় সাফল্যলাভ করে দ্বাদশ ত্রি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন। □

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
44th Year, 6th Issue, October 2015

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

ব্রিটেনের লেবার পার্টির নেতা নির্বাচিত হলেন বামপন্থী জেরেমি করবিন

লন্ডন থেকে পাওয়া ১২ সেপ্টেম্বরের খবর, ব্রিটেনের প্রধান বিরোধী দল লেবার পার্টির নতুন নেতা নির্বাচিত হলেন কট্টর বামপন্থী জেরেমি করবিন। নিজেকে তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং কার্ল মার্কসের ভক্ত বলেই স্বীকার করেন। এ হেন এক বামপন্থী নেতা লেবার পার্টির নেতা নির্বাচনে বিপুল ভোটে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে পরাজিত করায় ব্রিটেনের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বিস্মিত। জেরেমি করবিন আটবার এম পি নির্বাচিত হলেও বরাবরই লেবার পার্টির ক্ষমতা কাঠামোর বাইরে ছিলেন। এমনকি, লেবার পার্টির নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক এমপি'র সমর্থন পেতেও তাঁকে হিমসিম খেতে হয়। কিন্তু নির্বাচনে দাঁড়ানোর পরই তাঁর পক্ষে বিপুল সমর্থন দেখা যায়। নির্বাচনে ভোট পড়ে ৪লক্ষ ২২ হাজার ৬৬৪টি, জেরেমি পেয়েছিল ২ লক্ষ ৫১২ হাজার৪১৭টি ভোট। অর্থাৎ ৬০ শতাংশে ভোট পেয়েছেন তিনি। মোট ৪ জন প্রার্থীর মধ্যে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছেন ১৯ শতাংশে ভোট।

ব্রিটেনের বর্তমান ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টি যে ব্যয় সংকোচন নীতি গ্রহণ করেছে, তার কট্টর বিরোধী জেরেমি করবিন। তিনি ব্রিটনের পরমাণু অস্ত্র কর্মসূচী ট্রাইডেন্ট বিলোপের পক্ষে। ক্ষমতায় গেলে তিনি ব্রিটেনের রেল নেটওয়ার্ক জাতীয়করণের অঙ্গীকার করেছেন। এছাড়াও ব্রিটেনের ট্রেড ইউনিয়নগুলির ক্ষমতা খর্ব করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে বিল আনা হচ্ছে সেটিরও তিনি তীব্র বিরোধিতা করেছেন। করবিন প্রকাশ্যেই যুদ্ধ বিরোধী। যে কারণে তিনি তাঁর নিজের দল যখন ক্ষমতায় ছিল তখন ইরাক-লিবিয়া আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। যেমন এখন সিরিয়া সেনা অভিযানে রক্ষণশীল ক্যামেরনের বিরুদ্ধে। □

রাষ্ট্র সঙ্ঘের সদর দপ্তরে উড়লো প্যালেস্তাইনের পতাকা

গত সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর দিকেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর দপ্তরে প্যালেস্তাইন ও ভ্যাটিকানের পতাকা উড্ডয়নের প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু প্রস্তাবের বিরোধিতা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তাদের মদতপুষ্ঠ ইজরায়েল সহ ছয়টি দেশ। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১ অক্টোবর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর দপ্তরের মাথায় উত্তোলিত হলো প্যালেস্তিনীয় পতাকা। এই পতাকা উত্তোলনের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব বান-কি-মুন, প্যালেস্তাইনের রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আব্বাস। সাধারণ পরিষদে ভাষণ দিতে গিয়ে আব্বাস ইজরায়েলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ১৯৯৩ সালে ইজরায়েলের সঙ্গে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তার শর্ত অনুযায়ী ইজরায়েল প্যালেস্তাইনের মাটিতে বসতি স্থাপন বন্ধ না করা পর্যন্ত এবং বন্দি প্যালেস্তিনীয়দের মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত প্যালেস্টাইন একা চুক্তি বাস্তবায়নে আর কাজ করবে না। চুক্তির শর্তপূরণ না হওয়া পর্যন্ত ইজরায়েলের সঙ্গে আর কোনো আলোচনা নয়। কারণ, কেবল আলোচনার স্বার্থে আলোচনা করে আর লাভ নেই। তিনি বলেন, ইজরায়েলী দখলদারিত্ব বন্ধ করার জন্য বরং আর্ন্তজাতিক শক্তিকে কাজে লাগানো বেশি ফলদায়ক হবে। উল্লেখ্য, ২০১২ সালে প্যালেস্তাইনকে সদস্যপদ নয়, পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ। □

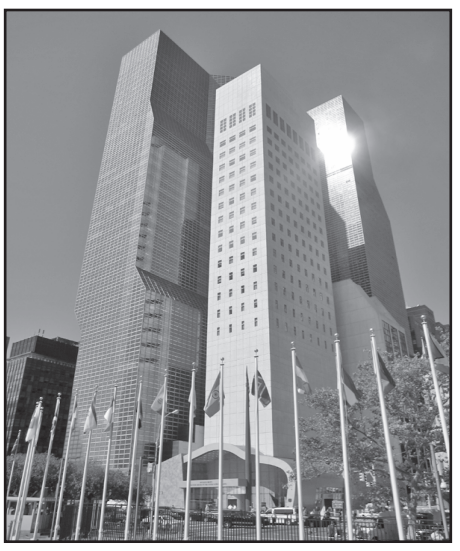

নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন কে পি শর্মা ওলি

নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১২ অক্টোবর দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন দেশের প্রধান কমিউনিস্ট নেতা কে পি শর্মা ওলি। নেপালের সংসদ সর্বসম্মতিতে দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ঠিক করতে না পারায় ১১ অক্টোবর রবিবার ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (এমালে)-র চেয়ারম্যান ওলি পান ৩৩৮টি ভোট, যা প্রয়োজনীয় ২৯৯টির থেকে ৩৯টি বেশি। অন্যদিকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নেপালী কংগ্রেসের প্রার্থী ও দেশের সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সুশীল কৈরালা পেয়েছেন ২৪৯টি ভোট। নেপালের সংসদে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে ভোট দেন ৫৮৭ জন সাংসদ। ওলিকে সমর্থন জানায় নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি মাওবাদী (ইউ সি পি

এন), রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টি-নেপাল, মদেশী জনাধিকার ফোরাম-ডেমোক্র্যাটিক এবং কিছু আঞ্চলিক দল। অপর দিকে কৈরালাকে সমর্থন করে চারটি মদেশীয় দলের জোট ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক মদেশী ফ্রন্ট। ২০১৪ সালে নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (এমালে) -র সমর্থন নিয়েই প্রধানমন্ত্রী হন কৈরালা। সেই বছরেই নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (এমালে)-র চেয়ারম্যান হন ওলি (৬৩)। ২০০৬ সালে নেপালের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী গিরিজা প্রসাদ কৈরালার মন্ত্রিসভায় উপপ্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রী হয়েছিলেন ওলি। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, অত্যন্ত সমস্যা বহুল সময়ে এই দায়িত্বভার গ্রহণ ওলির কাছে এক কঠিন পরীক্ষা, যখন দেশে নতুন সংবিধান নিয়ে মদেশীয় সম্প্রদায়ের একটি অংশের মধ্যে তুমুল ক্ষোভ তৈরী হয়েছে এবং তার ফলে প্রতিবাদ বিক্ষোভের জেরে বন্ধ ভারত সীমান্তে অবস্থিত বাণিজ্যপথ, ভারত সীমান্তে তরাই অঞ্চলে জ্বলছে অশান্তির আগুন। এর প্রায় পক্ষকালের মধ্যেই নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (এমালে)-র সহ-সভাপতি বিদ্যাভান্ডারীকে প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত করে ইতিহাস গড়ল নেপালের সংসদ। কমিউনিস্ট নেত্রী ভান্ডারী পেয়েছেন ৩২৭টি ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বী নেপালী কংগ্রেস প্রার্থী ২১৪টি ভোট। বিদ্যা ভান্ডারীকে সমর্থন করেছে এমালে সহ নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী), রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টি (নেপাল), মদেশীয় জনাধিকার ফোরাম (লোকতান্ত্রিক) -র সদস্যরা। □

দেবাশীষ রায়

বিশ্ববিখ্যাত বামপন্থী সাহিত্যিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের ওপর ২৪ বছর ধরে চরবৃত্তি চালিয়েছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই — জানালো ওয়াশিংটন পোস্ট

টানা দু'যুগ ধরে কলম্বিয়ার পৃথিবী বিখ্যাত সাহিত্যিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের ওপর চরবৃত্তি চালিয়েছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফ বি আই)। সে সম্পর্কে এফবিআইর একটি ডকুমেন্ট ফাঁস করে সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র ওয়াশিংটন পোস্ট এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশ করেছে। ঐ সংবাদে বলা হয়েছে, এই চরবৃত্তি শুরু ১৯৬১ সাল থেকে। সেই সময় মার্কেজ সপরিবারে ম্যানহাটনে ছিলেন। কিউবান এজেন্সি 'প্রেসনা লাতিনা'র সাংবাদিক হিসাবে কর্মসূত্রেই তিনি নিউইয়র্কে এসেছিলেন পরবর্তী সময় কিউবার রাষ্ট্রপতি ফিদেল কাস্ত্রো'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যদিও এই চরবৃত্তি কেন চালানো হত সেই বিষয়টি স্পষ্ট নয়।

তবে, এফবি আই এই ডকুমেন্ট এখনও গোপনই রাখতে চাইছে। ঐ নথি অনুযায়ী, ঐ সময় সাহিত্যিক হিসাবে একটু আধটু পরিচিত হচ্ছেন তিনি। এফবি আই ডিরেক্টর জে এডগার হুভার কোনো কারণ না জানিয়েই আদেশ দেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখা মাত্রই যেন এই সাহিত্যিকের ওপর নজরদারি চালানো হয়। প্রসঙ্গত, মার্কেজের পুত্র অধুনা লস এঞ্জেলেস নিবাসী বর্ডারগো জানিয়েছেন, তাঁরা কিছুই জানতেন না। এখন জেনে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছেন। □

নয়নতারা সেহগাল

আক্রান্ত বহুত্ববাদ, আক্রান্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা

প্রতিবাদে মুখর দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের শাসনের একবছর পেরোতে না পেরোতেই প্রকাশ্যে এসে পড়েছে বিজেপি তথা আরএসএস-এর হিডেন্ এজেন্ডা। আক্রান্ত ভারতের বহুত্ববাদী সংস্কৃতি, গণতন্ত্র, বিপন্ন সভ্যতাও। আরএসএস-এর নেতৃত্বে হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসী আক্রমণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংখ্যালঘুরাই শুধু নয়, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন যাঁরা, এমনকি বি জে পি ঘনিষ্ঠদেরও আক্রমণ করা হচ্ছে। মুম্বাইতে পাকিস্তানের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী খুরশিদ মাহমুদ কসৌরির বই প্রকাশ নিয়ে শিবসেনার আপত্তিকে আমল না দেওয়ার খেসারত দিতে হয়েছে একদা বিজেপি ঘনিষ্ঠ সুধীন্দ্র কুলকার্নিকে। তার মুখে কালি লেপে দেয় শিবসেনার সমর্থকেরা। সেই কালিমালিপ্ত মুখের ছবি বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশের পর সারা বিশ্বে এই কর্মকাণ্ড নিন্দিত হয়েছে। এরপর মুখে কালি দেওয়া হয়েছে কাশ্মীরের বিধায়ক শেখ আব্দুল রুশিদকে ও এফ আর টি আই কর্মীকে।

এতদ্সত্ত্বেও হিন্দুত্ববাদীদের ভ্রূক্ষেপ নেই। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের দাদরিতে ফ্রিজে গোমাংস রাখার গুজব ছড়িয়ে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে মহম্মদ আখলাখ নামে জনৈক এক প্রৌঢ়কে। একই ঘটনা ঘটানো হয়েছে সিমলাতে। জনৈক এক রামসেবকের গোমাংস পরিবেশন করা হচ্ছে, এই অভিযোগ পেয়ে দিল্লী পুলিশ সব শিষ্টাচার ভুলে কেরল ভবনে হানা দেয়। দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠায় পুলিশ অবশেষে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয় অভিযোগকারীকে। মানুষ কি

রোমিলা থাপার

খাবে, কি খাবে না তাও নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে আরএসএস,

পি এম ভার্গভ

বিশ্বহিন্দুপরিষদ, বজরং দলের মত হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। বিজ্ঞানমনস্কতার পক্ষে, কুসংস্কারের বিপক্ষে, সাম্প্রদায়িকতা-জাতপাতের বিরুদ্ধে যে সমস্ত প্রগতিশীল ব্যক্তি সোচ্চার হচ্ছেন তাঁদের আক্রমণ করা হচ্ছে, এমনকি খুনও করা হচ্ছে। এই কারণেই নরেন্দ্র দাভোলকার, গোবিন্দ পানসারে, এম এম কালকুর্গির মত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে খুন হতে হয়েছে তথাকথিত হিন্দুত্ববাদীদের হাতে। লেখকদের কলম কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, গুলাম আলির মত বিশিষ্ট গজল গায়ককে অনুষ্ঠান করতে দেওয়া হচ্ছে না। বৃদ্ধি পাচ্ছে দলিতদের উপর আক্রমণ। সম্প্রতি শুধু দলিত হবার অপরাধে হরিয়ানায় দুটি ফুটফুটে শিশুকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এই হত্যাকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে সংঘের মুখপত্র 'পাঞ্চজন্য'তে।

এভাবেই ইতিহাসের চাকা পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দেবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে হিন্দু মৌলবাদীরা। হিন্দুত্ববাদী সংগঠন আরএসএস-র প্রচারক বাকপটু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই প্রসঙ্গে মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ **www.statecoord.org**
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।